অদ্ভুত যত ভূতের গল্প

banglabooks.in

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

অদ্ভুত যত ভূতের গল্প

সম্পাদক

গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু

দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

ADBHUT JATA BHUTER GALPA
CODE NO. 63 A 20

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

পুনর্মুদ্রণ ঃ
জুন
২০০৮
১৫

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
বি· পি· এম্‌স্‌ প্রিণ্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগনা (উত্তর)

banglabooks.in

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১।	কঙ্কালের টঙ্কার	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১
২।	কঙ্কাল-সারথি	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১৫
৩।	গুণী	চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৩
৪।	গঙ্গাধরের বিপদ	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪০
৫।	অ্যাড্‌ভেঞ্চার	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	৪৬
৬।	নমস্কার	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	৫৪
৭।	ভৌতিক	সুকুমার দে সরকার	...	৬৭
৮।	ডাক্তারের রক্ষা নেই	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	...	৭৪
৯।	ভৌতিক কাহিনী	গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	...	৮২
১০।	মেট্রোতে বুড়ী	বুদ্ধদেব বসু	...	৮৭
১১।	বন্ধু	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	৯১
১২।	খুড়া মহাশয়	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	...	৯৮
১৩।	গল্পের শেষে	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	১০৯
১৪।	ভূতের গান	ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১১৮
১৫।	ছবির ভূত	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১২১
১৬।	আমার ভূত দেখা	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	...	১২৯

—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতুম, আমার আত্মীয়রা আমায় তিরস্কার করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা করতেন, মাষ্টারমশাই প্রহার দিতেন এবং কাগজের সম্পাদকেরা না-ছেপে ফেরত দিতেন। কিন্তু ব'লে রাখি, একদিন সমূহ বিপদ্ থেকে যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, সে শুধু আমার ঐ কবিত্বশক্তির জোরে। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ, কবিতা আমার প্রাণরক্ষা করলে কেমন ক'রে? সত্যি বল্‌ছি, সেদিন কারো সাধ্য ছিল না যে, মরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করে! ভাগ্যে কবিতা লিখতে শিখেছিলুম, তাই বেঁচে গেলুম। নইলে লোকের অত্যাচারে কবিতা-লক্ষ্মীকে বাল্য বয়সে বিদায় দিলে, সেদিন আমার যে কি অবস্থা হতো, তা আমিই জানি।

গল্পটা তাহ'লে খুলেই বলি। নানা স্থান ঘুরে আমি যাচ্ছিলুম জয়পুর থেকে দিল্লী। টাইম-টেব্‌ল্ খুলে দেখলুম, টানা দিল্লী যেতে হ'লে রাত্রের গাড়িটাই—সুবিধে। কিন্তু সে-ট্রেণ অনেক রাত্রে ছাড়ে—প্রায় দুটো। একে জয়পুরের মত জায়গা, তায় মাঘ-মাসের শীত, তার উপর রাত্রি দুটো—এই ব্রাহস্পর্শ ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা করতে আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কিন্তু উপায় কি? আমি ষ্টেশন-মাষ্টারকে বল্লুম—"কি উপায় করা যায়, বলুন দেখি? এই দারুণ শীতে ভোর-রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রেণ-ধরবার কথা মনে করতেই তো আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে!"

ষ্টেশন-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি ফার্ষ্ট-ক্লাস প্যাসেঞ্জার?"

তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল-কোম্পানী আধাভাড়ায় সর্ব্বত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা করায় আমি সস্তায় বড়-মানুষী করছিলুম। বুক ফুলিয়ে বল্লুম—"হ্যাঁ, আমার ফার্ষ্ট-ক্লাসের টিকিট।"

ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন—"প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভালো ব্যবস্থা আছে।"

আমি বল্লুম—"কি?"

তিনি বল্লেন—"আপনি এক কাজ করবেন। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে ষ্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একটা ফার্ষ্ট-ক্লাস গাড়ি ঐ সাইডিঙে কেটে রেখে দেবো, আপনি তাইতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়বেন—লেপ মুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রে যখন মেল আসবে, তাইতে আপনার গাড়ি লাগিয়ে দেবো—আপনি দিব্যি ঘুমতে ঘুমতে দিল্লী গিয়ে পেঁছবেন।"

আমি বল্লুম—"বাঃ, এ তো বেশ!"

ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন—"হ্যাঁ, শীতের রাতে গাড়ি ধরবার অসুবিধে ব'লেই তো কোম্পানী বড়-লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।"

আমি বল্লুম—"খুব ভালো ব্যবস্থা। আমি তাহ'লে আটটার মধ্যেই আসবো—আপনি গাড়ি ঠিক করে রাখবেন।"

তিনি বল্লেন—"গাড়ি ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরী করবেন না। আটটার পর আর ট্রেণ নেই ব'লে আমরা আটটার সময় ষ্টেশন বন্ধ ক'রে চলে যাই।"

আমি বল্লুম—"আটটার মধ্যেই আসবো।" ব'লে আমি চলে গেলুম।

তারপর সন্ধ্যাবেলা আহারাদি সেরে পায়ে তিনজোড়া ডবল-মোজা, গায়ে দুটো গরম গেঞ্জির উপর একটা মোটা ফ্লানেলের কামিজ, তার উপর সোয়েটার, তার উপর তুলো-ভরা মেরজাই, তার উপর ওয়েষ্ট কোট, কোট, ওভার-কোট এবং সর্ব্বোপরি একটা মোটা বালাপোষ মুড়ি দিয়ে, মাথাটাকে কান-ঢাকা টুপি ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এঁটে কাঁপতে-কাঁপতে ঠিক আটটার সময় ষ্টেশনে এসে হাজির হলুম। আমার মস্ত-বড় লোহার তোরঙ্গটা দু'জন কুলি এসে ধরাধরি ক'রে নামাতে গিয়ে একজন ফিক্ ক'রে একটু হেসে ছেড়ে দিলে। আমি বল্লুম—"কেয়া হলো রে?"

সে বল্লে—"বাবুজির তোরঙ্গ দেখছি ফাঁকা। যা দু-একঠো ধুতি-উতি আছে, সেগুলো গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সটা আমাদের বখশিস্ ক'রে যান বাবু—আপনার কুলি-ভাড়া, রেল মাশুল অনেক বেঁচে যাবে।"

আমি বল্লুম—"যা, যা, তোম্‌কো আর ইয়ে করতে হবে না!" ব'লেই আমি হন্ হন্ ক'রে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরের দিকে চলে গেলুম। ষ্টেশন-মাষ্টার আমায় দেখেই বল্লেন—"গুড্ ইভ্‌নিং বাবু! আপনার ভাগ্য খুব ভালো—আজ আর কোনো প্যাসেঞ্জার নেই; সমস্ত গাড়িটাই আপনার একলার! চলুন, আপনাকে

গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।" ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম্ম পেরিয়ে, পাঁচ-ছয়টা রেল-লাইন টপ্‌কে, অনেক-দূর চলে চলে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাঁড় করালেন। সামনে দেখলুম, একখানা ধোঁয়াটে রঙের গাড়ি কাটা পড়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটা কন্ধকাটা, অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

মাষ্টারবাবু গাড়িটার চাবি খুলে দিয়ে বল্লেন—"নিন্—উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন।" ব'লেই তাড়াতাড়ি তাঁর হাত-বাতিটা তুলে নিয়ে "গুড নাইট্" ব'লে ছুট্ দিলেন। অন্ধকারে তাকে আর দেখতে পেলুম না, রেল-লাইনের খোওয়াগুলোর উপর তাঁর জুতোর খস্‌খস্ শব্দ কেবল শুনতে লাগলুম। ছ্যাঁৎ ক'রে আমার মনে হলো—তাইতো', মাষ্টারবাবু অমন ক'রে পালালেন কেন?

ইতিমধ্যে দেখি, কুলি-দুটো আমার তোরঙ্গ ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েই বল্‌ছে—"বাবুজি পয়সা।" আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই, তারাও ছুট্ দিলে ষ্টেশনের দিকে। ব্যাপার কি? আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ভাবছি, দেখি, দুটো কয়লা-মাখা কালো ভূত রেল-লাইনের বাঁধের নীচ থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারটে সাদা চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেখতে ষ্টেশনের দিকে চলে গেল। তাদের পিছনে একটা কুকুর ল্যাজ তুলে দৌড় দিলে! তার পরেই সব একেবারে নিস্তব্ধ!—একেবারে অন্ধকার!

অমাবস্যার রাত্রি—চারিদিকে অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্ করছে। সেই অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এদিক্-ওদিক্ চারদিক্ দেখতে লাগলুম—আশে-পাশে কেউ নেই, দূরে কেবল গাছগুলো অসাড় হয়ে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ভিতরটা কেমন ছম্‌ছম্ করতে লাগলো।

আমি আস্তে-আস্তে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলুম। গাড়ির ভিতরটা একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। তাড়াতাড়ি দেওয়াল হাৎড়ে বিজ্‌লিবাতির চাবি টিপলুম—খুট্ ক'রে শব্দ হলো, আলো হলো না। সর্ব্বনাশ! আলো নেই না কি? আলোর সুইচ্ নিয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করলুম, কোনই ফল হলো না, যেমন অন্ধকার তেমনই! পকেট খুঁজলুম, দিয়েশলাই নেই। কেমন ক'রেই বা থাকবে? আমি তো চুরুট খাই না—লুকিয়েও না। হয় তো তোরঙ্গের মধ্যে একটা দিয়েশলাই আছে; চাবি খুঁজতে লাগলুম, পৈতেতে চাবি বাঁধা ছিল; বালাপোষ, ওভার-কোট, কোট, ওয়েষ্ট-কোট, সোয়েটার-গেঞ্জির গোলক-ধাঁধার মধ্যে কোথায় যে পৈতে-গাছটা হারালো, কিছুতেই খুঁজে পেলুম না। বামুনের ছেলে, বিপদে-আপদে, বিদেশ-বিভুঁয়ে যজ্ঞোপবীতটাই মস্ত সহায়! সেটাকেও শেষে খোওয়ালুম।

সেই অন্ধকারে আমার যেন হাঁপ ধরতে লাগলো। অন্ধকার যে জাঁতাকলের মতো মানুষের বুককে এমন ক'রে পিষ্‌তে থাকে—এ আমি জানতুম না। আমি গাড়ির মধ্যে এদিক্-ওদিক ক'রে ছট্‌ফট্ করতে লাগলুম। মনে হলো যেন প্রাণ বেরিয়ে যাবে। মাথা ঘুরতে লাগলো—চোখের সাম্‌নে নানা-রকম ছায়া দেখতে

লাগলুম, কানে কাদের সব ফিস্-ফিস্ কথা এসে লাগতে লাগলো! কোথায় একটু আলো পাই? আমি ছুটে গাড়ি থেকে বেরিয়ে রেলের লাইন থেকে দুটো পাথর তুলে ঠক্-ঠক্ ক'রে সজোরে ঠুক্‌তে লাগলুম—যদি একটু আলোর ফিন্‌কি পাই! কিন্তু হায় অদৃষ্ট, আলোর বদলে পাথর-কুচির ফিন্‌কি এসে আমার চোখ-দুটোকে ঝন্‌ঝনিয়ে দিলে!

আমি দু-হাতে চোখ রগ্‌ড়াতে-রগ্‌ড়াতে ষ্টেশনের দিকে ছুট্ দিলুম—যেমন ক'রে পারি, সেখান থেকে একটা আলো নিয়ে আসব। ষ্টেশন মাষ্টারটা কি পাজি! এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আমায় একা ফেলে গেল, একটা আলো দিল না! বল্লে কি না, দিব্যি ঘুমতে ঘুমতে যাবেন! পাজি কোথাকার!

আমি ছুটতে-ছুটতে একেবারে ষ্টেশনের কাছে এসে হাঁপ নিয়ে দাঁড়ালুম—প্ল্যাটফর্ম্মের কিনারায় যে একটা বাঁকা খেজুরগাছ ছিল, ঠিক তার সাম্‌নে। কিন্তু এ কি? এই তো সেই খেজুরগাছ; এই তো—এই তো রয়েছে। কিন্তু ষ্টেশন কোথায়? আমি এদিক্-ওদিক চারদিক্ চেয়ে দেখলুম—ষ্টেশন নেই। মনে হলো, কালো শ্লেটের গা থেকে ছেলেরা যেমন তাদের আঁকা ছবিগুলো মুছে ফেলে, ঠিক তেমনি ক'রে অন্ধকারের গা থেকে ষ্টেশনকে একেবারে কে মুছে ফেলেছে!

আমার বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠলো। আমি আর তিল-মাত্র না দাঁড়িয়ে আবার ছুটলুম—যে-পথে এসেছিলুম, সেই পথে—আমার গাড়ির দিকে। টপাটপ পাঁচ-ছয়টা লাইন টপকে ছুটতে-ছুটতে আমি যখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি অতবড় গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে! গাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। কি সর্ব্বনাশ!

আবার ভালো ক'রে চারদিক্ চেয়ে দেখলুম—ষ্টেশনও নেই, গাড়িও নেই। চারিদিক্ খাঁ-খাঁ করছে! এখন উপায়? এই-রাত্রে আশ্রয় পাই কোথা? করি কি? কিন্তু ষ্টেশনের দিক্‌টার সেই খাঁ-খাঁ মূর্ত্তি মনে হয়ে আমার বুকটা ছ্যাৎ ক'রে একবার মনে হলো, যাই, আর-একবার গিয়ে ভালো ক'রে ষ্টেশনটা খুঁজে আসি। উঠলো। ছেলেবেলায় গল্পে শুনতুম, দৈত্যদানারা রাতারাতি বড়-বড় বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাড়ি সেইখানে রেখে যেতো—এ কি তাই হলো নাকি? মনে তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই!

হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠে মনে হলো, এমন ক'রে রেল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা তো ঠিক নয়—আচম্‌কা একখানি গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যেতে পারে! যেই এই কথা মনে হওয়া, তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সরে অন্যদিকে ছুটে গেলুম! কিন্তু যেদিকে যাই, সেইদিকেই রেলের লাইন! সাম্‌নে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, যেদিকে ছুটি, সেইদিকেই দেখি, রেলের লাইন লোহার জাল দিয়ে আমায় ঘিরে ফেলেছে—পালাবার উপায় আর নেই! আমার এই ছুটোছুটি দেখে অন্ধকার থেকে কারা যেন হঠাৎ খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। আমি চমকে উঠে থেমে দাঁড়াতেই

টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধের উপর থেকে গড়াতে গড়াতে নীচে এক গাছতলায় এসে পড়লুম। মনে হলো প্রাণটা যেন বাঁচলো। ট্রেণ-চাপা পড়বার আর ভয় নেই।

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। মনে হ'তে লাগলো—কতক্ষণে রাত্রিটা কাট্‌বে। কিন্তু রাত্রির যেন আর শেষ নাই। বসে-বসে দেখতে লাগলুম, নিস্তব্ধ রাত্রি ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে-করতে আরো নিঝুম হয়ে আস্‌ছে। আর রাত্রের অন্ধকারটা তার কালো রাতের উপর চাম্‌চিকের ডানার মতো একখানা কালো কুৎসিত কম্বল আস্তে-আস্তে টেনে মুড়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর গা থেকে একে-একে সব জিনিষ যেন মুছে আস্‌ছে। দেখতে-দেখতে আমি-শুদ্ধ যেন মুছে আসতে লাগলুম। কালো জুতো মোজা-পরা আমার লম্বা পা-দুখানা একটু-একটু ক'রে মুছে গেল। কালো ওভারকোট ও নীল বালাপোষ-মোড়া গা—তাও আস্তে-আস্তে মুছতে লাগলো। যখন প্রায় কোমর অবধি মুছে গেছে, আমি আর সে-দৃশ্য দেখতে পারলুম না—তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেল্লুম। চোখ বুজে মনে হ'তে লাগলো—আমি আছি কি নেই?—আছি কি নেই?

"আছে, আছে—এইখানে আছে।" ব'লে কানের কাছে কে একজন চীৎকার ক'রে উঠলো। আমি চোখ চেয়ে দেখি, মানুষের দেহের মেদ-মাংস ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয়, তেমনিতর একটা কঙ্কাল তার কাঠির মতো সরু-সরু লম্বা আঙুল নেড়ে ইসারা ক'রে কাকে ডাকছে। দেখতে-দেখতে ঠিক তারই জুড়ি আর-একটা কঙ্কাল লাফাতে-লাফাতে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর আর একটা!

দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে-আস্তে সরে আমার খুব কাছে এসে ঘাড় হেঁট ক'রে আমায় দেখতে লাগলো। তার চোখের উপর চোখ পড়তে দেখলুম—না আছে পাতা, না আছে তারা, শুধু দুটো গোল-গোল গহ্বর কালো কট্‌কট্‌ করছে! সে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—"এই নাকি সে?"

প্রথম কঙ্কালটা বল্লে—"সে না তো কে?"

দ্বিতীয়টা বল্লে—"বেশ বেমালুম লুকিয়েছে তো, একেবারে চেনবার যো নেই!"

শেষ-কঙ্কালটা ছুটে এসে বল্লে—"কৈ, দেখি!" ব'লে তার হাড় বার-করা আঙুলগুলো দিয়ে টিপে টিপে আমায় দেখতে লাগলো।

"ও আর দেখছিস্‌ কি? ও সে-ই! আমার চোখে কি ধুলো দেবার যো আছে—হাজারই লুকোক না!" ব'লে প্রথম কঙ্কালটা এতখানি হাঁ ক'রে বিকট শব্দে হেসে উঠলো। মুখের ভিতর থেকে তার সেই সাদা সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধরলে।

শেষ-কঙ্কালটা বল্লে—"তবু একটু পরখ কোরে নেওয়া ভালো। কি জানি, যদি ভুল হয়।"

প্রথম কঙ্কাল বল্লে—"নে, আর পরখ করতে হবে না; ওদিকে লগ্ন বয়ে যায়।"

ব'লে সে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি ভাবলুম—ব্যাস্, এইবার আমার শেষ!

দেখতে-দেখতে বাকি-দুটো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা-দুখানা ধরলে, প্রথমটা মাথার দিক্‌টা ধরলে; তারপর তিনজনে মিলে মাটি থেকে চ্যাংদোলা ক'রে আমায় তুলে ফেল্লে। আমি তাড়াতাড়ি দু-দাত দিয়ে গাছের গুঁড়িটা চেপে ধ'রে ব'লে উঠলুম—"কোথায় নিয়ে যান মশাই!"

তারা বল্লে—"বিয়ে দিতে।"

আমি চম্‌কে উঠে বল্লুম—"বিয়ে দিতে কি মশাই!—এই বুড়ো বয়সে?"

একজন বল্লে—"বুড়ো বরই আমরা পছন্দ করি।"

আমি বল্লুম—"মশাই, আমার চেয়ে ঢের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে যান্ না, আমায় কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন!"

প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—"তুমি ভেবেছ, পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে? তোমাকে আমরা জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবো।"

আমি বল্লুম—"আমি তো মশাই, পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই। সেই ছেলেবেলায় একবার পালিয়েছিলুম বটে; তারপর তো জ্যাঠামশাই পুলিশ দিয়ে ট্রেণ থেকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেন।"

সে বল্লে—"আমরাও পুলিশ এসেছি, ধ'রে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দেবো ব'লে।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম—"কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে পারব না!"

—"পারবে না কি? বিয়ে তোমায় করতেই হবে। এমন কি তোমার গোঁ?" ব'লে সেই পয়লা-নম্বরের কঙ্কালটা ভীষণ গর্জ্জন ক'রে উঠলো।

আমি বল্লুম—"রাগ করেন কেন মশাই? আমি ছাড়া কি পাত্র নেই? কত ছেলে হয়তো খুশি হয়ে বিয়ে করবে।"

সে বল্লে—"এত রাত্রে এখন ভালো পাত্র পাই কোথা? যার-তার হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না? চল, লগ্ন বয়ে যায়।"

আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্লুম—"তাহ'লে নিতান্তই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে?"

শেষ কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম সুরে বল্লে—"দুঃখ করছিস্ কেন ভাই ক্যাংলা?"

আমি তড়াক্ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম—"ক্যাংলা কে মশাই! আমি তো ক্যাংলা নই। আমি শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমার পিতার নাম মধুসূদন চক্রবর্ত্তী।"

প্রথম কঙ্কালটা হো-হো ক'রে হেসে উঠে বল্লে—"রাধে মাধব! রাধে মাধব!"

আমি বল্লুম—"সে কি মশাই?"

সে বল্লে—"এই এত রাত্রে, এই শ্মশানের ধারে একটা জ্যান্ত শেয়াল-কুকুর থাকে না, আর মাধব চক্রবর্ত্তী আছে। তুই এতই বোকা পেলি আমাদের?"

আমি বল্লুম—"এই তো আমি রয়েছি!"

সে বল্লে—"আরে ভাই, মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহের ভিতর থেকে কথা কইলেই কি তুই মাধব চক্রবর্ত্তী হয়ে যাবি?"

আমি বল্লুম—"সে কি মশাই! মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহের ভিতর আবার কে এলো?"

সে বল্লে—"আরে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্ত্তীর শূন্য দেহের মধ্যে সেঁধিয়ে আছিস্, সে কি আমি টের পাইনি ভেবেছিস্?"

আমি বল্লুম—"এসব কি হেঁয়ালি বকছেন মশাই? মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহের মধ্যে যদি ক্যাংলা এলো, তো মাধব চক্রবর্ত্তী গেল কোথা?"

সে বল্লে—"আরে ভাই, বামুনের ছেলে সে, বৈকুণ্ঠে গেছে।"

আমি বল্লুম—"না-মরেই সে বৈকুণ্ঠে গেল?"

সে বল্লে—"মরেছে না তো কি!"

আমি বল্লুম—"মরেছে কি রকম! সে মরে গেল আর টের পেলে না?"

সে বল্লে—"মানুষ কখন জন্মায় আর কখন মরে, সে তা টের পায় নাকি!"

কথাটা শুনে বোঁ ক'রে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমার অজান্তে আমি মরে গেলুম না কি—অ্যাঁ? সেই যে দেখলুম পৃথিবীর গা থেকে একে-একে সব মুছে আসছে—সেই কি আমার মৃত্যু না কি? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। হয়তো এ আমি নই—এ আর কার আত্মা আমার শূন্য শরীর দখল করেছে। নইলে এই কঙ্কালগুলোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইতে পারতুম? জ্যান্ত মানুষ কি কখনো তা পারে। কিন্তু মারা গেলুম কেমন ক'রে? আমার তো রোগ হয়নি। হয়তো ঐ বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ার সময় পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে—আমি টের পাইনি।

ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঘুলিয়ে যেতে লাগলো। কেমন মনে হ'তে লাগলো—না, আমি মাধব চক্রবর্ত্তী নই। এরা ঠিকই বলেছে—কাঙালীচরণের আত্মা আমার শূন্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে বসেছে। তাইতে আমার দেহের ভ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্ত্তীর জের বুঝি এখনো চল্‌ছে। কিন্তু কাঙালীচরণ লোকটা কে? আমি যদি কাঙালীচরণ হব, তবে আমি আমাকে চিন্‌তে পারছি না কেন? এরা তো চিন্‌তে পেরেছে!

প্রথম কঙ্কালটা ব'লে উঠলো—"কি হে ক্যাংলা, কি ভাব্‌ছ? বিয়ে করবা'র মতি স্থির হলো?"

আমি বল্লুম—"আচ্ছা মশাই, আমি কি সত্যি কাঙালীচরণ?"

সে খানিক আমার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে বল্লে—"সে কিরে ক্যাংলা, তুই নিজেকে নিজে চিন্‌তে পারছিস্ না?"

আমি বল্লুম—"না।"

সে বল্লে—"সর্ব্বনাশ হয়েছ! তুই আমাদেরও চিনতে পারছিস না?"

আমি বল্লুম—"একটুও না।"

সে বল্লে—"তোর মনে পড়ছে না—আজ এই অমাবস্যার দিনে ঘুটঘুটে লগ্নে তোর বিয়ে—রাগেশ্বরীর সঙ্গে?"

আমি বল্লুম—"কৈ, আমার তো কোনো বিয়ের কথা হয়নি!"

সে বল্লে—"সে কিরে! তোর গায়ে-গোবর পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না?"

আমি বল্লুম—"গায়ে-গোবর কাকে বলে?"

সে বল্লে—"তুই অবাক্ করলি। তোর কিছু মনে পড়ছে না? গায়ে-গোবরের দিন ভোর-রাত্রে তালপুকুরে তুই মাছ মারতে যাচ্ছিলি তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে, তাল-গাছের মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে রাগেশ্বরী বর-পণের কড়ি বাচ্ছিল; তুই রাগেশ্বরীকে দেখতে পাসনি, সেও তোকে দেখতে পায়নি, তারপর তুই যেমন ঠিক তালগাছের তলাটিতে এসেছিস, অমনি রাগেশ্বরীর পা-দুটো দুল্‌তে-দুল্‌তে তোর কপালে এসে ঠক্ ক'রে লেগে গেল। রাগেশ্বরী তো লজ্জায় সাত-হাত জিভ্ কেটে, মাথায় ঘোম্‌টা টেনে দৌড়! আর তুই বাড়িতে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে এসে বল্লি—ও-মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। কেন রে, কেন—কি হয়েছে? তুই বল্লি,—ওর পা আমার কপালে ঠেকেছে। তাতে হয়েছে কি? তুই বল্লি—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! ব'লে তুই "কপাল চাপড়াতে লাগলি! এসব তোর মনে পড়ছে না?"

আমি বল্লুম—"মনে পড়ছে, এই রকম একটা গল্প যেন কোথায় শুনেছিলুম। তারপর কি হলো?"

সে বল্লে—"সর্বনাশ কর্‌লি! তারপরেও তোর মনে পড়ছে না? তারপর তো গুরুঠাকুর এলেন; এসে বিধেন দিলেন যে, রাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঠেকেছে, তুই সাত-একে-সাতশোবার তোর পা দিয়ে তার মাথাটা থেঁৎলে দে, তাহ'লেই সব দোষ খণ্ডে যাবে। তুই বল্লি—ওরে বাপ্‌রে! রাগেশ্বরীর মাথায় লাথি-মারা! সে আমি পারব না!—ব'লে তুই ছুট্ দিলি।"

আমি বল্লুম—"তার পর?"

সে বল্লে—"তার পর আজ বিয়ের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে-খুঁজতে এই শ্মশান-ঘাটে এসে দেখি, তুই এই মাধব চক্রবর্ত্তীর মড়াটাকে দানা পাইয়ে বসে আছিস্। হাঁরে, এই মাধব চক্রবর্ত্তীকে যারা পোড়াতে এসেছিল, তারা গেল কোথায়? তোকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে বুঝি?"

আমি বল্লুম—"মাধব চক্রবর্ত্তীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না?"

সে বল্লে—"তোর কিছুই মনে পড়ছে না? তুই সত্যি বলছিস্, না মস্করা করছিস্?"

আমি বল্লুম—"তোমার দিব্যি, আমি সত্যি বলছি।"

সে বল্লে—"তবে সর্ব্বনাশ হয়েছে—তোকে মানুষে পেয়েছে।"

আমি বল্লুম—"মানুষে পেয়েছে কি গো!"

সে বল্লে—"জানিস্ না বুঝি, আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপি, মানুষেও তেমনি আমাদের কারো-কারো ঘাড়ে চাপে। তুই যখন মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহে সেঁধিয়েছিলি, তখন বোধ হয় তার একটু খানি প্রাণ ছিল, সেইটে তোকে পেয়ে বসেছে।"

আমি বল্লুম—"তাতে কি হয়?"

সে বল্লে—"মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিন্‌তে পারে না, আপনার লোককে চিন্‌তে পারে না, আবোল-তাবোল বকে, কট্‌মট্ ক'রে চোখ ঘুরোতে থাকে, আমাদেরও ঠিক তেমনি হয়। তাই তো তুই অমন করছিস্—নিজেকে চিন্‌তে পারছিস্ না, আমাদেরও চিন্‌তে পারছিস্ না।"

আমি বল্লুম—"ও, তাই আমি নিজেকে ক্যাংলা ব'লে চিন্‌তে পারছি না। ওগো, তবে আমার কি হবে?"

সে বল্লে—"যেমন বিয়ে করবো না বোলে পালিয়ে এসেছিস্, তেমনি ঠিক জব্দ।"

আমি বল্লুম—"ওগো, আমি রাগেশ্বরীকে বিয়ে করবো—আমাকে উদ্ধার করো।"

সে বল্লে—"তবে বেরিয়ে আয়—ওখান থেকে।"

আমি বল্লুম—"বেরুব কি ক'রে গো?"

সে বল্লে—"পথ হারিয়ে ফেলেছিস্ বুঝি? মুস্কিল করলি দেখছি! এক কাজ কর। মাধব চক্রবর্ত্তীর ঐ কোঁচার খুঁট্‌টা এই গাছের ডালে বেঁধে গলায় একটা ফাঁস দিয়ে তুই ঝুলে পড়—তাহ'লেই সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌বি।"

আমি আঁৎকে উঠে বল্লুম—"ওরে বাপ্‌রে—সে যে ফাঁসি! সে আমি পারব না!"

সে বল্লে—"ভয় কি! আমি তো কতবার ফাঁসি গেছি! তোর কোনো ভয় নেই, তুই ঝুলে পড়।"

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বল্লুম—"না গো না—সে আমি পারব না! গলায় ফাঁসি দিতে কিছুতেই পারব না।"

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঙ্কালটা তার সেই কালো গর্ত্তের মত চোখ-দুটোকে বন্ বন্ কোরে ঘুরিয়ে বল্লে—"কী, তুই ফাঁসি যেতে পারবি না! আমরা হলুম গলায়-দড়ে! তুই আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে এমন কথা বলিস্ যে, ফাঁসি যেতে তোর ভয় হয়—কুলাঙ্গার কোথাকার!"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম—"কি করব, আমার যে ভয় করছে!"

সে দাঁতের দু-পাটি কড়মড় করতে করতে বলে উঠলো—"ফের ঐ কথা! এই বেলা ঝুলে পড়, নইলে তোর ভালো হবে না বলছি!"

আমি বল্লুম—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি ফাঁসিতে ঝুলতে পারব না—আমার ভয় করছে।"

সে আরো রেগে বল্লে—"হতভাগা—কোথাকার! দূর হ, আমাদের সামনে থেকে দূর হ!" ব'লে সে তেড়ে আমায় মারতে এলো।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"রাগ করেন কেন খুড়ো মশাই। ও হয় তো ক্যাংলা নয়! নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবে কেন?"

খুড়ো মশাই বল্লেন—"কী! ক্যাংলা নয় ও? আমি সাত-বচ্ছর টিক্‌টিকি পুলিশে কাজ করেছি, কত বড়-বড় ফেরার পাকড়াও করেছি—আমার ভুল হবে?"

শেষ-কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন একবার পরখ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি দাদামশাই?"

দাদামশাই বল্লেন—"আচ্ছা বেশ, পরীক্ষা হোক্" ব'লে আমার দিকে ফিরে বল্লেন—"কি হে, তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী, না কাঙালীচরণ?"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে, আগে তো জানতুম আমি মাধব চক্রবর্ত্তী, কিন্তু তারপর থেকে মনে হচ্ছে কাঙালীচরণ।"

সে বল্লে—"কাঙালীচরণ যদি হও, তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ ব'লে তোমায় শাস্তি নিতে হবে—তোমায় ফাঁসি দেবো আমরা, এই শ্মশানে—এই গাছের ডালে!"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে, আমি তবে মাধব চক্রবর্ত্তী।"

সে বল্লে—"বেশ, মাধব চক্রবর্ত্তী ব'লে যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পার, তাহ'লে তোমায় তিনবার সেলাম ঠুকে আমরা চলে যাব।"

—"আর যদি না পারি?"

—"তাহ'লে এইখানে তোমার ঘাড় মট্‌কে রেখে চলে যাব!"

—"ঘাড় মট্‌কে দেবেন? সর্ব্বনাশ! এই বিদেশ-বিভুঁয়ে, এই অচেনা জায়গায় এত রাত্তিরে নিজেকে কি ক'রে প্রমাণ করবো মশাই?"

—"না পার, ঘাড়টি মট্‌কে দেবো—শ্মশানের ভূত হয়ে থেকো।"

সত্যি বল্‌ছি এই কথা শুনে আমি কেঁদে ফেল্লুম। তখন সেই দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"কাঁদছ কেন? তোমার এমন কোনো চিহ্ন নেই, যাতে প্রমাণ হয়, তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী?"

আমি বল্লুম—"আছে। এই দেখুন, আমার ডানহাতে একটা জড়ুলের দাগ।"

সে হেসে বল্লে—"ও প্রমাণ তোমাদের পুলিশের কাছে চলে, এখানে আমাদের কাছে চলে না। কোন ভিতরের প্রমাণ দিতে পার?"

আমি বল্লুম—"আমার ভিতরে কি আছে না আছে, আমি তো জানি না মশাই! এই দেখুন না, আমার ভিতরে কাঙালীচরণ আছে, কি মাধব চক্রবর্ত্তী আছে, আমি তাই ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।"

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীরস্বরে ব'লে উঠলো—"কাঙালীচরণ হ'লে তোমায় ফাঁসি দেবো কিন্তু।"

আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলুম—"আজ্ঞে না, না, আমি মাধব চক্রবর্ত্তী!"

সে বল্লে—"শীগ্‌গির প্রমাণ কর, নইলে ঘাড় মট্‌কালুম ব'লে!"

দ্বিতীয় কঙ্কালটা বল্লে—"অমন ঘেবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কি এমন কোনো গুণ নেই যাতে বোঝা যায় তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী?"

আমি ব'লে উঠলুম—"হ্যাঁ, আছে বৈ কি! আমার একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পারি!"

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে—"তুমি কবিতা লিখতে পার? নিজে লেখ? না পরের কবিতা নিজের ব'লে চালাও?"

আমি বল্লুম—"না মশাই, আমি সে-রকম কবি নই।"

সে বল্লে—"তোমার কবিতা কাগজে ছাপা হয়?"

আমি বল্লুম—"না, সম্পাদকরা ভয়ে ছাপেন না।"

সে বল্লে—"ভয়ে ছাপেন না কি রকম?"

আমি বল্লুম—"আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীর যে, একবার সে-কবিতা ছাপলে পাঠকরা অন্য কবিতা পড়তেই চাইবে না। কাগজ ভর্ত্তি করা তখন দায় হয়ে উঠবে। এ-কথা এক সম্পাদক আমায় নিজের মুখে বলেছেন।"

সে বল্লে—"আচ্ছা! কৈ দেখি, একটা কবিতা লেখ দিকিন!"

আমি তখনই ওভারকোটের পকেট থেকে আমার পকেট-বইখানা বার ক'রে বল্লুম—"আলো একটা চাই যে!"

সে বল্লে—"দিচ্ছি আলো।" ব'লে খানিকটা ধুলো-বালি একত্র করে একটা ফুঁ দিলে, আর অমনি আগুন জ্বলে উঠলো। আমি সেই আলোয় বসে লিখতে লাগলুম।

খানিকটা লিখেছি সে বল্লে—"কৈ, কি লিখ্‌লে পড়।"

আমি বল্লুম—"এখনও যে শেষ হয়নি মশাই!"

সে বল্লে—"কবিতার আবার শেষ আছে না কি? যা লিখেছ পড়—ফাজলামি করতে হবে না।"

আমি সুর কোরে পড়লুম—

"পড়িয়ে বিপদে তারা,
হয়েছি মা দিশে-হারা!
উদ্ধার এ-দুঃখ-কারা-
গার হ'তে মা-জননী!
শ্মশানে বসিয়ে ডাকি,
ভয়ে ঘোরে শির-চাকি,

খাবি খায় প্রাণ-পাখী,
শূন্য হেরি এ ধরণী!
কোথা মোর গেহ-খাঁচা,
কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে মা, আমারে বাঁচা
দিয়ে তোর পা-তরণী!"

এইটুকু শেষ হ'তেই সে বল্লে—"ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে! এ-রকম গান তো আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদের মুখে শুনেছি। এ তোমার নিজের লেখা না, পুরানো গান একটা মুখস্থ ছিল, তাই লিখে শোনাচ্ছ?"

আমি বল্লুম—"না মশাই, এ আমার নিজের রচনা। একেবারে টাট্‌কা। এতে আপনি পুরোনোর গন্ধ কোথায় পেলেন? দেখছেন না, একেবারে আধুনিক ধরনের লেখা!"

সে বল্লে—"থাম, তোমায় আর জ্যাঠাপনা করতে হবে না। পুরোনো একটা গান চুরি ক'রে নিয়ে আমায় ফাঁকি দেবে ভেবেছ? তা হচ্ছে না। দেখি তুমি কত বড় ওস্তাদ! আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে পার?"

আমি বল্লুম—"খুব পারি। নাম দিয়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছি। তেলের নাম দিয়ে, ওষুধের নাম দিয়ে, অনেক ভালো-ভালো কবিতা আমার লেখা আছে। একবার একটা জুতোর দোকানের কবিতা লিখে আমি প্রাইজ পেয়েছিলুম। আপনার নামটা কি বলুন, আমি এখনি লিখে দিচ্ছি।"

সে বল্লে—"আমার নাম জাঁদ্‌রেল। লিখে ফেল দেখি এই নাম দিয়ে একটা কবিতা চট্‌ ক'রে। বুঝব কত বড় বাহাদুর তুমি!"

আমি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে লিখতে শুরু করেছি মাত্র, সে বল্লে—"কি লিখলে, পড় হে! আমিও বড় কবিতা দু-চক্ষে দেখতে পারি না।"

আমি বল্লুম—"মশাই, আর একটু সময় দিন।" ব'লে আমি খস্‌ খস্‌ শব্দে লিখে যেতে লাগলুম।

একবার একটু থেমেছি, সে আমার খাতার দিকে ঝুঁকে দেখে বল্লে—"উঃ, অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবার পড়।"

অগত্যা আমি পড়লুম—

"রেল আছে, জেল আছে,
আর আছে কৎবেল;
পাশ্‌ আছে, ফেল্‌ আছে,
আর আছে শূল শেল;
ঢোল আছে, চোল আছে,
আর আছে সারখেল

সব সে বড়া হ্যায়
জাঁদ্‌রেল জাঁদ্‌রেল!"

পড়া শেষ হ'তেই সে চীৎকার ক'রে উঠলো—"বাঃ, বাঃ, বেড়ে লিখেছ তো হে! আর একবার পড় তো, আর একবার পড় তো!"

আমি আর একবার চীৎকার ক'রে পড়লুম—"রেল আছে, জেল আছে ইত্যাদি।"

সে আবার বল্লে—"বেশ হয়েছে! চমৎকার হয়েছে! যাও, প্রমাণ হয়ে গেল তুমি কবি মাধব চক্রবর্ত্তী!"

আমি বল্লুম—"ঠিক বল্‌ছেন মশাই, আমি কাঙালীচরণ নই?"

সে বল্লে—"কাঙালীচরণের চৌদ্দপুরুষ এমন কবিতা লিখতে পারে না। মাধব চক্রবর্ত্তী না হ'লে এমন কবিতা লেখে কে?"

আমি বল্লুম—"মশাই, আমার আর একটা কবিতা শুনবেন? এই খাতায় লেখা আছে—এই জয়পুরের শীত সম্বন্ধে।"

সে বল্লে—"কৈ, শোনাও তো দেখি!"

আমি তাড়াতাড়ি পকেট-বইয়ের পাতা হাত্‌ড়ে কবিতাটা বার ক'রে পড়তে সুরু করলুম—

"বস্তা-বস্তা পুঞ্জ-পুঞ্জ তীব্র হিম ঢেলে
ব্যোম-মার্গে কে রচিল শীতের পাহাড়?
লেপ-গদি বালাপোষ সর্ব্ব বর্ম্ম ভেঙে
কম্প এসে কাঁপাইছে শরীরের হাড়!
ঊর্দ্ধ্ব-ফণা ক্রুদ্ধ শত নাগিনীর প্রায়
কপালে-কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিম্বা কোন্ পিশাচিনী উন্মাদিনী-সমা
তীক্ষ্ম-ধার ছুরিকায় করিছে কোতল!
অথবা কি মেঘ-দৈত্য ছোঁড়ে শার্পনেল—"

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠলো—"ওরে ক্যাংলাকে পাওয়া গেছে!"

আমি চম্‌কে উঠে, পড়া থামিয়ে চেয়ে দেখি, আমার সামনের কঙ্কাল তিনটে লাফাতে লাফাতে ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি "রাম! রাম!" বল্‌তে বল্‌তে সেখান থেকে উঠে পড়লুম। এতক্ষণ 'রাম-নামটা যে কেন মনে আসেনি' কে জানে?

আমি রেল-লাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দুটো কুলির সঙ্গে দেখা। তারা বল্লে—"বাবু, আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?"

আমি আর কি বল্‌ব? বল্লুম—"আমি এখানে ঐ ইয়ে হচ্ছিল কি না, তাই একটু দেখছিলুম।"

তারা বল্লে—"আপনার গাড়ি ঠেলে আমরা ঐ ওদিকে রেখে দিয়েছি। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিই।" ব'লে তারা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে।

আমি গাড়িতে উঠে বল্লুম—"হাঁরে, গাড়িতে আলো-নেই কেন?"

সে বল্লে—"বিজ্‌লি বাতি আছে, মেল-গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বল্‌বে।"

আমি বল্লুম—"আমাকে একটা বাতি দিয়ে যেতে পারিস্‌?—বখশিস দেবো!"

তাদের একজন ছুটে গিয়ে একটা বাতি এনে দিলে। আমি সেইটে সামনে রেখে পকেট-বই খুলে নিজের লেখা কবিতা পড়তে লাগলুম।

কঙ্কাল-সারথি

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

উঃ—ম্যালেরিয়ার মতন ছ্যাঁচ্‌ড়া অসুখ পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি? উঁহু।

এই দ্যাখ না, সখ্‌ ক'রে সেদিন ঢাকুরিয়ার 'লেক' দেখতে গিয়েছিলুম, সন্ধ্যার একটু আগে। হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে আমার জ্বর এল।

সেকি যে-সে জ্বর, যে-সে কাঁপুনি? না পারি দাঁড়াতে, না পারি বসতে, একেবারে ঘাসের উপর পড়লুম শুয়ে। কী শীত রে বাপ্‌! পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হয়ে রইলুম!

সেই ভাবে কতক্ষণ ছিলুম, ভগবান্‌ জানেন। তবে একবার চাদরের ভিতর থেকে

জ্বল্-জ্বল্ ক'রে চোখ মেলে উঁকি মেরে দেখলুম, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারের মেলা বসেছে, কোথাও জন-মানবের সাড়া নেই!

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কোথায় বাগবাজারে আমার বাড়ী, আর কোথায় প'ড়ে আছি আমি, একলা! গুণ্ডায় গলায় ছুরি বসাতে পারে, সাপে কামড়াতে পারে, বিনা-চিকিৎসায় প্রাণপাখী ফুড়ুক ক'রে পালিয়ে যেতে পারে! বাড়ীর লোক এতক্ষণে হয়তো ভেবে সারা হ'চ্ছে!

আর তো এখানে থাকা চলে না! যেমন ক'রেই হোক্, আমাকে আজ বাড়ী যেতেই হবে।

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। গায়ের ভিতর দিয়ে তখনো যেন আগুনের ঝলক্ ছুট্‌ছে, চোখের সামনে দিয়ে যেন রাশি রাশি সর্ষে ফুল নাচতে নাচতে একবার আঁধার-সাগরে ডুবে যাচ্ছে, আর একবার ভেসে উঠছে! প্রতিবার পা ফেলি আর মনে হয়, এই বুঝি আমি দড়াম্ ক'রে পপাত ধরণীতলে হলুম! তবু থামলুম না, মাতালের মতন টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চললুম।

রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে! সেই রাত্রে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, পৃথিবী কত-বেশী স্তব্ধ হ'তে পারে! সহরের হট্টগোলে রাগ হয় বটে, কিন্তু এ স্তব্ধতাও সহ্য করা অসম্ভব! একটা ব্যাং, কি একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা, কি একটা পাহারাওয়ালার নাক পর্য্যন্ত ডাকছে না, গাছের পাতায় বাতাসের একটু নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না! সারি সারি কোম্পানীর আলোর থামগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চক্ষে যেন থম্‌থমে অন্ধকারকে নিরীক্ষণ করছে! তিমির-তুলির প্রলেপ-মাখানো গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীর পর বাড়ী দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারাও যেন প্রেতপুরীর মতন নিস্তব্ধ—তাদের ভিতর থেকে একটা ঘুম-ভাঙা খোকার কান্নার আওয়াজ পর্য্যন্ত জেগে উঠছে না। কে যেন আজ নিদুটীর মন্ত্র প'ড়ে সমস্ত জগৎকে বোবা ক'রে দিয়ে গেছে।

জ্বরের ঘোরে চলেছি তো চলেছিই—এই নিঃশব্দ পল্লী ছেড়ে সহরের শব্দের রাজ্যে গিয়ে পড়বার জন্যে প্রাণ যেন আই-ঢাই করতে লাগল, তবু এ পথ আর শেষ হ'তে চায় না। এ পথ যেন আজও শেষ হবে না, কালও শেষ হবে না—আমাকে যেন কোন অভিশপ্ত আত্মার মতন চলতে হবে অনন্ত কাল ধ'রে! এক বেচারা ইহুদীর গল্প পড়েছিলুম। কার শাপে তাকে নাকি অনন্তকাল ধ'রে সারা বিশ্বে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে হয়েছিল। আমারও তাই হ'ল নাকি?—

মাথাটা একবার নাড়া দিয়ে ভাবলুম,—দূর ছাই! এ-সব কি উদ্ভট কথা ভাবছি? জ্বরে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মাঝে মাঝে এক-একটা মাঠ—যেন এক-একটা অন্ধকারের মায়া-সরোবর। সেখান দিয়ে যেন অন্ধকারের ঢেউ বইছে, অন্ধকারের স্রোত ছুটে আসছে আমাকে গ্রাস করবার জন্যে! অন্ধকারের তরঙ্গের ভিতরে গাছগুলোকে দেখাচ্ছে যেন বড় বড়

—"যা লিখেছি পড়— ফাজলামি করতে হবে না।"

"এই বেলা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও গো!"

দৈত্য-দানবের মত—পথিকের হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে খাবার জন্যে তারা ওৎ পেতে প্রস্তুত হয়ে আছে। কান্না-ভরা কন্‌কনে বাতাস এসে চুপিচুপি যেন আমার কাণে কাণে ব'লে যাচ্ছে—ওহে নিঝুম রাতের অজানা মানুষ! এ মৃত্যুপুরীর ভিতর দিয়ে কোথায় চলেছ তুমি? আমার কথা শোনো, ভূত-প্রেতরা একে একে জেগে উঠছে, এই বেলা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও, যাও গো!...

আরো খানিক অগ্রসর হয়ে মনে হ'ল, পৃথিবীর সমস্ত শব্দ এসে আমার দুই পায়ের দুই জুতোর ভিতর আশ্রয় নিয়েছে। প্রত্যেকবার পা ফেলি, আর সেই শব্দগুলো জুতোর ভিতর থেকে চম্‌কে উঠে, রাজপথের উপরে আছাড় খেয়ে প'ড়ে আমাকে চম্‌কে চম্‌কে তোলে! শব্দ শুনতে চাই, নিজের পায়ের শব্দ পাচ্ছি; কিন্তু কেন জানি না, সে শব্দ শুনে শুনে মন আমার খুসি হবে কি, আরো বেশী নেতিয়ে পড়তে লাগল!—সে যেন রাজপথে ঘুমন্ত কোন অশরীরী প্রেতাত্মার চীৎকার, আমার পদাঘাতে সে যন্ত্রণায় গজ্‌রে উঠছে!

* * * *

আঃ! এতক্ষণ পরে রসা রোডের মোড়ে এসে পড়লুম। অশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ট্রামওয়ের একটা লোহার থামে ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলুম।

এখানটাও তেমনি নির্জ্জন ও তেমনি নিস্তব্ধ হলেও আমার মন যেন অনেকটা আরাম পেলে! এই তো ট্রামের রাস্তা, এই পথ ধ'রে সিধে গেলেই—যত মাইল দূরেই থাক্—আমাদের পাড়া বাগবাজার পাওয়া যাবেই যাবে! খানিক দূর এগুতে পারলেই লোকজনেরও সাড়া পাব নিশ্চয়, আর ট্রাম ও বাস বন্ধ হ'লেও ট্যাক্সি মেলাও তো অসম্ভব নয়!

তখন জ্বরে আমার চোখ ছল্-ছল্ করছে, কাণ করছে ভোঁ-ভোঁ, আর মাথা ঘুরছে বোঁ-বোঁ ক'রে! বার বার ইচ্ছে হ'তে লাগল পথের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বার জন্যে; কেবল বাপ-মায়ের বিষণ্ণ মুখের কথা ভেবেই মনের সে ইচ্ছা দমন করলুম, অনেক কষ্টে। নিজে-নিজেই বললুম, মন, তুমি শান্ত হও! এই পথের শেষেই আছে তোমার বাড়ী, তোমার আত্মীয়-স্বজন, তোমার নরম তুল্‌তুলে বিছানা! কোন রকমে চক্ষু মুদে এই পথটুকু পার হ'তে পারলেই—ব্যাস্, সকল কষ্ট সকল ভাবনার অবসান!

হঠাৎ দূর থেকে একটা শব্দ জেগে উঠে চারদিকের নিস্তব্ধতার মুখে যেন ভাষা দিলে। ঘড়্-ঘড়্ ঘড়্-ঘড়্ ক'রে একটা বাজ-ডাকার মতন শব্দ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে...তারপরেই শুনলুম ভেঁপুর আওয়াজ—ভোঁপ্, ভোঁপ্, ভোঁপ্, ভোঁপ্!

ট্যাক্সি, না বাস্?

আহ্লাদে চাঙ্গা আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

তারপরেই দেখা গেল, নীচে দুটো আর উপরে একটা আলো। তিনটে আলো দেখেই বুঝলুম...ট্যাক্সি নয়, বাস্ আসছে।...তা'হলে জ্বরের ধমকে আমি ভুল বুঝেছিলাম, বাস্ যখন চলছে তখন রাত খুব বেশী হয়নি! কিন্তু আশ্চর্য্য, এরই মধ্যে এ-অঞ্চলটা এমন ভয়ানক নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে? বাবা, আমার কল্‌কাতার গোলমাল বেঁচে থাক্, এ-অঞ্চলে আবার ভদ্রলোক বাস করে?

কিন্তু বাসের আলো অত বেশী জ্বলছে কেন? সামনের সারা পথে সে যেন আগুনের ঢেউ বইয়ে ছুটে আসছে! আর এই নিরালা পথে অত জোরে ভেঁপু বাজাবারই বা দরকার কি? এ-অঞ্চলের সন্ধ্যের পরেই ঘুমকাতুরে লোকগুলোর কাণে যে তালা ধ'রে যাবে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ধুলোয় ধুলোয় পথ অন্ধকার ক'রে একখানা রাঙা টক্‌টকে মস্ত-বড় বাস্ আমার কাছে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন তীব্র, তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল,—"ধর্ম্মতলা, ওয়েলেস্‌লি, শ্যামবাজার!"

আমি তাড়াতাড়ি বাসে উঠে একখানা গদীমোড়া আসনের উপর গিয়ে ধুপ্ ক'রে বসে পড়লুম। হোক্, শ্যামবাজারের বাস, এই স্তব্ধ মড়ার মুল্লুক থেকে এখন তো স'রে পড়ি! শ্যামবাজার থেকে বাগবাজার পায়ে হেঁটে যেতে এমন বিশেষ দেরি লাগবে না।

... ...

... ...

কিন্তু কেন জানি না, বাসের ভিতরে ঢুকেই আমার বোধ হ'ল, আমি যেন এক জগৎ ছেড়ে আর এক অচেনা জগতের ভিতরে প্রবেশ করলুম!

বাস্ ছুটছে, তার ভেঁপু বাজছে। এত বেগে বাস্ ছুটছে, তার জান্‌লাগুলো সব খোলা রয়েছে, অথচ বাহির থেকে বাতাসের একটুখানি ঝলক পর্য্যন্ত আমার গায়ে লাগছে না! ভারি অবাক্ হয়ে গেলুম। আমার জ্বর কি এত বেশী উঠেছে যে, দেহের অনুভব করবার ক্ষমতাটুকুও আর নেই?

পথ তেমনি নির্জ্জন আর নিঃসাড়। কিন্তু বাতাসও কি আজ ঘুমিয়ে পড়েছে? আমার খালি মনে হ'তে লাগল, দম বন্ধ হয়ে সারা পৃথিবী আজ মারা পড়েছে—তার কোথাও আর জীবনের লক্ষণ নাই। বেঁচে আছি খালি আমি, ও এই বাসের ড্রাইভার আর কন্ডাক্টার।

আমরা তিনজন ছাড়া বাসের ভিতরেও কোন আরোহী ছিল না। থাকবেই বা কেন? এত রাতে কার ঘাড়ে ভূত চাপবে যে, বাসে চ'ড়ে বেড়াতে বেরুবে!

বাসে ভেঁপু বাজছে, আর বাজছে, আর বাজছে! কাণ যে ঝালাপালা হয়ে গেল! কন্ডাক্টারের দিকে ফিরে বিরক্ত স্বরে বললুম—"ড্রাইভারকে বারণ করে দাও। পথে লোকও নেই, গাড়িও নেই,—তবু এত 'হর্ণ' বাজছে কেন?"

লোকটা শিখ। মস্ত-বড় লম্বা দেহ, মস্ত-বড় দাড়ি। সে কালা আর বোবার মত আমার পানে তাকিয়ে রইল।

আবার বললুম—"শুন্‌চ? 'হর্ণ' দিতে বারণ কর।"

সে তবু জবাব দিলে না, ড্রাইভারকে 'হর্ণ' থামাতেও বললে না। লোকটা সত্যি-সত্যিই কালা ও বোবা নাকি? কিন্তু না, তাই বা হবে কি ক'রে? এই খানিক আগেই তো সে "ধর্ম্মতলা, ওয়েলেস্‌লি, শ্যামবাজার" ব'লে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করছিল।

সে বোধ হয়, আমার কথার জবাব দিতে চায় না। এরা কি ভেবেছে, এদের ভেঁপুর আওয়াজে সারা সহরের ঘুম ভেঙে যাবে, আর তাহ'লেই সবাই বিছানা থেকে লাফিয়ে প'ড়ে এসে বাসের প্যাসেঞ্জার হয়ে বসবে?

কিন্তু সহর জাগবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করলে না। পথের আশেপাশে নেড়ী কুকুরগুলো আরাম ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু এই বাসের সাড়া পেয়েই তারা তাড়াতাড়ি উঠে, ল্যাজ পেটের তলায় ঢুকিয়ে ছুটে পালাতে লাগল—মহা-ভয়ে কেঁউ কেঁউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে!...আজকে বাইরের জীবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কেবল ঐ কুকুরগুলোর কাছ থেকে, কিন্তু তারাও দেখা দিয়েই অদৃশ্য হচ্ছে!

কুকুরগুলো কেন আমাদের বাস্‌ দেখে পালাচ্ছে? মনের ভিতরে কেবল এই প্রশ্নই জাগতে লাগল—কেন? কেন? কেন?

কণ্ডাক্টার কেন আমার কথার জবাব দিচ্ছে না?—কেন? কেন? কেন? ড্রাইভার কেন ক্রমাগত ভেঁপু বাজাচ্ছে?—কেন? কেন? কেন?

... ...

... ...

কণ্ডাক্টারের দিকে ফিরে বললুম, "তোমার ভাড়ার পয়সা নাও।"

সে মস্ত একখানা কালো হাত বাড়ালে। ভাড়া দিয়ে টিকিট নেবার সময় আমার হাতে তার হাতের ছোঁয়া লাগল—উঃ, অমনি মনে হ'ল কে যেন একখানা তীক্ষ্ণ বরফের ছুরি দিয়ে আমার হাতে খ্যাঁচ্‌ ক'রে খোঁচা মারলে। জ্যান্ত মানুষের হাত এমন ঠাণ্ডা কন্‌কনে হয়!

আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম! তার লম্বা চুল আর দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ভরা মুখখানা বাসি-মড়ার মুখের মত স্থির। তার চোখেও পলক পড়ছে না। তার চোখ যেন পাথরে গড়া!

আমার বুকটা গুড়গুড় করতে লাগল। আজকের সহরের এই নির্জ্জনতা পৃথিবীর এই নিঃশব্দতা, বাতাসের এই অভাব, ভাড়াটে বাসের এই ভেঁপুর আওয়াজ, কণ্ডাক্টারের এই উদাসীন মূর্ত্তি—সমস্তই যেন রহস্যময়, সমস্তই যেন অস্বাভাবিক।

কী কুক্ষণেই আজ বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছি!

যতবার ফিরে তাকাই, ততবারই কন্ডাক্টারের সেই মড়ার মত স্থির মুখ আর পলক-হারা পাথুরে দৃষ্টি চোখে পড়ে! কেমন একটা অমানুষিক ভাবে আমার মনটা ছেয়ে গেল—আর সহ্য করতে পারলুম না—সামনের বেঞ্চের উপরে, দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে চোখ মুদে আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। ভাবলুম, শ্যামবাজারে পেঁছবার আগে আর মাথা তুলে চাইব না!

কিন্তু মাথা তুলতে হ'ল—আবার চোখ খুলতেও হল।

আধ ঘণ্টার বেশী সময় কেটে গেছে, গাড়ীও না থেমে ক্রমাগত ছুটছে, তবু এখনও শ্যামবাজার এল না কেন?

মুখ তুলে জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। শ্যামবাজার তো অনেক দূরের কথা, গাড়ী এখনো ভবানীপুরেই আসে নি! অথচ গাড়ী এত বেগে ছুট্‌ছে যে, পথের দু-পাশের বাড়ীগুলো তীরের মতন পিছনে স'রে স'রে যাচ্ছে! এও কি সম্ভব?

হতভম্বের মতন মুখ ফিরিয়েই দেখি, গাড়ীর ভিতরে দশ-বারোজন লোক ব'সে রয়েছে! নিজের চোখকেও আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না!

আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, এতক্ষণের ভিতরে গাড়ী একবারও থামে নি, তবু কোত্থেকে এরা এল, কখন এরা গাড়ীতে উঠল?

একে একে সকলকার মুখের পানেই তাকিয়ে দেখলুম, সব মুখই মড়ার মতন স্থির, নির্বিকার! সব চোখের পাথুরে দৃষ্টিই আড়ষ্ট হয়ে আছে। কে যেন শ্মশান থেকে কয়েকটা মৃতদেহ তুলে নিয়ে এসে বেঞ্চের উপর সারি সারি বসিয়ে দিয়ে গেছে!

তাদের ভিতরে বাঙালী আছে, খোট্টা আছে, সায়েব আছে। কিন্তু তারা সবাই চেয়ে আছে আমার দিকেই। সে চাউনিতে কোন ভাবের আমেজ নেই, সে-চাউনি যেন চাউনিই নয়—অথচ সে চাউনি দেখলেই গা ছম্‌ছম্‌ করে, দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়! তাদের চাউনি যেন চোখের ভিতর দিয়ে আসছে না,—আসছে আলোকের উপর ওপার থেকে, অন্ধকারের আত্মার ভিতর থেকে, যে-দেশে জ্যান্ত মানুষ নেই, সেই দেশ থেকে! ভাবহীন অথচ ভয়ানক তাদের সেই চাউনি!

আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, গাড়ীর ঝাঁকুনিতেও তাদের কারুর দেহ একটুকুও নড়ছে না! গাড়ীর ভিতরে ব'সেও তাদের দেহ যেন গাড়ীকে না ছুঁয়ে শূন্যে বিরাজ করছে! মনে হ'তে লাগল, আমার অজ্ঞাতসারে যেমন হঠাৎ তারা গাড়ীর ভিতরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তেমনি হঠাৎ তারা আবার হাওয়া হ'য়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারে, আমার অজান্তেই! যেন তারা ছায়ার কায়াহীন অনুচর—দেখা দেয়, ধরা দেয় না। তাদের দেখা যায়, ধরা যায় না।

আমার সভয় দৃষ্টি আবার পথের দিকে ফিরিয়ে নিলুম। গাড়ী তেমনি হেঁচ্‌কি-তোলা আওয়াজের মতন ভেঁপুর শব্দ করতে করতে তীরবেগে ছুট্‌ছে

—কিন্তু তখনো ভবানীপুর আসে নি! আমি শ্যামবাজার, না সোজা ঘমালয়ের দিকে চলেছি?

কি এক দুঃসহ, অজানা টানে অস্থির হয়ে চোখ আবার গাড়ীর ভিতরে ফেরালুম! গাড়ীতে ইতিমধ্যে লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে উঠেছে—তারাও স্থির-নেত্রে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে!

সমস্ত গাড়ীর ভিতরে একটা বোটকা গন্ধ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—যেন বাসি মড়ার গন্ধ! হাসপাতালের মড়ার ঘরে গিয়ে আমি একবার এই রকম গন্ধই পেয়েছিলুম!

আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিলে, বুকের কাছটা শিউরে শিউরে উঠতে লাগল—আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি?

আর থাকতে না পেরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললুম, "এই কণ্ডাক্টার, গাড়ী বাঁধো!"

কণ্ডাক্টার কোন সাড়া দিলে না, গাড়ী থামাবারও চেষ্টা করলে না।

আবার বললুম, কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

রেগে দাঁড়িয়ে উঠে কণ্ডাক্টারের দেহ ধ'রে আমি নাড়া দিতে গেলুম—কিন্তু তাকে ছুঁতেও পারলুম না। চোখের সামনে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে পারছি না—সে-দেহ যেন হাওয়া দিয়ে তৈরী!

হঠাৎ গাড়ীর সব লোক একসঙ্গে অট্টহাস্য সুরু ক'রে দিলে! সে অদ্ভুত বীভৎস হাসি আসছে যেন অনেক দূর থেকে, অনেক আকাশ-বাতাস ভেদ ক'রে, অনেক সমুদ্র-প্রান্তর পার হয়ে, অনেক নরকের অন্ধকারে ডুব দিয়ে—অথচ তার আওয়াজ এত স্পষ্ট যে, আমার কাণ যেন ফেটে যাবার মত হ'ল!

আমি পাগলের মত চীৎকার ক'রে বল্লুম, "গাড়ী থামাও, জল্‌দি গাড়ী থামাও,—এই ড্রাইভার!"—গাড়ী-থামানো ঘণ্টার দড়ি ধ'রে আমি ঘন ঘন নাড়তে লাগলুম!

ড্রাইভার এতক্ষণ পরে আমার দিকে মুখ ফেরালে—সে-মুখে এক তিলও মাংস নেই, সে-মুখ সাদা-ধবধবে হাড়ের মুখ—নাক-চোখের জায়গায় তিন-তিনটে গর্ত্ত, দু-ঠোঁটের জায়গায় দু' সারি দাঁত বেরিয়ে আছে।

এতক্ষণ তবে এই পোষাক-পরা কঙ্কালটাই গাড়ী চালিয়ে আসছে?

গাড়ীর ভিতরে অট্টহাসির আওয়াজ আরো বেড়ে উঠল!

আর সইতে পারলুম না—সেই ভীষণ অট্টহাসি শুনতে শুনতে আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

জ্ঞান হ'লে দেখলুম, নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছি, আমার চারপাশে বসে মা, বাবা, ভাই-বোনেরা।

শুনলুম, আমি নাকি রসা রোডের ফুটপাথের উপরে জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হ'য়ে শুয়েছিলুম।

কালকের রাতের বিভীষিকার কথা সকলকে বললুম।

বাবা বললেন, "ও-সব বাজে কথা। জ্বরের ঝোঁকে 'লেকে'র ধার থেকে রসা রোড পর্য্যন্ত এসেই তুমি বেহুঁস হ'য়ে প'ড়েছিলে। তারপর ঐ-সব খেয়াল দেখেছ।"

কিন্তু আমার মন বলতে লাগল—না, না, আমি যা দেখেছি, তা খেয়াল নয়!

গুলী

—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

গোকুল যখন বার বার তিনবার চেষ্টা করিয়াও এফ-এ পাশ করিতে পারিল না, তখন তাহার বাবা বলিলেন—তোর লেখাপড়া কিছু হবে না, তুই একটা চাকরী কর। কিন্তু গোকুল তাহার পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিল 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'। সে ঠিক করিল, দাসত্ব করা কিছু নয়; বাণিজ্য করিয়া লক্ষ্মীঠাকরুণকে রাতারাতি লোহার সিন্দুকে বন্দী করিতে হইবে। তাহাদের গ্রামের বিধু বাগচি কয়লার কারবার করিয়া বড়লোক হইয়া উঠিয়াছে—গাঁয়ের লোকের ভাষায় বলিতে গেলে আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে। সুতরাং সেই বাঁধা রাস্তা দিয়া লক্ষ্মীঠাকরুণের বাহনটিরও আসিতে কোন ক্লেশ ও আপত্তি না হইবারই কথা মনে করিয়া গোকুল কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল।

বছর-তিনেক ধরিয়া হাজার পনর-কুড়ি টাকা লক্ষ্মীর বাহনটিকে ঘুষ খাওয়াইল, কিন্তু কিছুতেই লক্ষ্মীর দর্শন মিলিল না। তখন দেনার দায়ে সর্বস্ব বরাকরের কয়লার খাদে বিসর্জ্জন দিয়া একখানি মাত্র দা কোনমতে বাঁচাইয়া গোকুল গজভুক্ত

কপিত্থের মতো বাড়ী ফিরিয়া আসিল। গোকুল মনে মনে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল যে, তাহার বাবা তাহাকে লোকসানের জন্য যদি অতিরিক্ত রকমের তিরস্কার করেন, তবে সে ঐ দাখানি গলায় বসাইয়া ব্যবসার শেষ দিয়া জীবনেরও শেষে একটি রক্তবর্ণ দাঁড়ি টানিয়া দিবে।

কিন্তু গোকুল আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, তাহার বাবা তাহাকে ব্যবসায়ে লোকসানের সম্বন্ধে না রাম না গঙ্গা কিছুই বলিলেন না, সহজ সাধারণভাবেই তাহাকে কুশল-প্রশ্ন করিয়া বাড়ীতে আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন। গোকুল হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—যাক্! বাবা তা হ'লে রাগ করেন নাই।

গোকুল নিশ্চিন্ত হইয়া পুকুরের মাছের মুড়ো ও বাড়ীর গাইয়ের ঘন-আওটানো দুধ খাইতে লাগিল।

একদিন তাহার বুড়ো বাবা কোঁচার টেরটি গায়ে দিয়া গোয়ালঘরের আগড় মেরামত করিতেছিলেন; গোকুল সামনে-খাটো পশ্চাতে-লম্বা ছিটের শার্ট গায়ে দিয়া বার্ণিশ-করা চকচকে পাতলা হাল্কা চটিজোড়াকে পায়ে করিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। বুড়া একবার ছেলের পাশ-পিছন চাঁছা চুলছাঁটার বাহার ও লম্বা-ঝুলের ফ্যাসান-দুরস্ত শার্টের দুই পকেটে হাত ভরিয়া দাঁড়াইবার কায়দা দেখিয়া লইয়া বলিলেন—বাবা গোকুল, তোমার সেই বিশ হাজার টাকা দামের দা-খানা একবার এনে দাও ত, আগড়খানা বেঁধে ফেলি!

গোকুল চোখমুখ লাল করিয়া বিশ হাজার টাকার দা-খানি বাবার সামনে রাখিয়া দিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ বলিলেন—যাও বাবা, বিধু বাগচির বৈঠকখানায় গিয়ে বোসো গে; এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, লোকে দেখলে ভাববে, বাবু জন খাটাচ্ছে!

গোকুলের সামনে সেই দা-খানা চকচকে দাঁত মেলিয়া পড়িয়া পড়িয়া হাসিতেছিল। গোকুল অল্পক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

গোকুল যেমন ছিল, তেমনি এক ছুটে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বরাবর ষ্টেশনে গেল এবং একখানি বরাকরের টিকিট করিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। গোকুল পণ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়াছে, যেমন করিয়া হোক টাকা উপার্জ্জন করিতে হইবে। কেমন করিয়া? তাহা সে জানে না।

গাড়ীর ঝাঁকানি খাইয়া মগজের মধ্যে ভাবনা-চিন্তাগুলা একটু থিতাইয়া গেলে গোকুল ঠিক করিল, বিনা মূলধনের ব্যবসা করিতে হইবে। এমন কোন্ ব্যবসা হইতে পারে? গোকুল ঠিক করিল, ডাক্তারী করিবে। কয়লার ব্যবসা-সম্বন্ধে তাহার যেমন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ছিল, ডাক্তারী-সম্বন্ধেও তেমনি; সুতরাং তাহার কাছে কয়লার ব্যবসা করা আর ডাক্তারী করা দুইই সমান। বরাকরে ব্যবসার সূত্রে অনেক চেনাশোনা হইয়াছে, রাতারাতি পসারটা জমিয়া যাইতে পারে বই কি!

গোকুল আপনার সেই পুরাতন পোড়ো ঘরে, কেরোসিনের বাক্সে আলমারী

গড়াইয়া দুটা-চারটা শিশি-বোতল রং-করা চিরেতার জল কুইনিন লইয়া ডাক্তার হইয়া জাঁকিয়া বসিল। কয়লার আড়তদার গোকুলবাবুকে রাতারাতি ডাক্তারবাবুতে পরিণত হইতে দেখিয়া বরাকরের লোকেরা আশ্চর্য্য হইল, শঙ্কিতও হইল।

অল্পদিনেই গোকুল বুঝিল, বরাকরের লোকদের সে যতটা বোকা ভাবিয়াছিল, তাহারা ততটা বোকা নয়। বরাকরের লোকের রোগ হয় নিশ্চয়, কিন্তু গোকুল-ডাক্তার একটা রোগীরও দেখা পায় না। একে রোগীর সন্ধান নাই, তাহার উপর মুদি, গোয়ালা কেহই আর ধারে উঠ্‌না জোগাইতে চাহে না, তাহারা বাকী টাকার তাগাদা আরম্ভ করিল। তাহারা এই গোকুলের কত টাকা খাইয়াছে, কিন্তু এমনি নিমকহারাম তাহারা, একটুও যদি চক্ষুলজ্জা রাখে! একটুও যদি খাতির-রেয়াৎ করিয়া চলে। গোকুল বরাকরের লোকগুলার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিতে লাগিল।

আগে গোকুল মনে করিয়াছিল, চেনাশোনা জায়গায় তাহার পসার জমিবে ভালো; এখন ঠেকিয়া বুঝিল, ঠকাইতে হইলে অচেনা জায়গাতেই সুবিধা অধিক। গোকুল চাটিবাটি তুলিয়া মুস্কিল-আসানের আশা করিয়া আসানসোলে গেল।

বরাকরে লোকের সঙ্গে চেনাশোনা হইয়া গিয়াছিল, সেখানে মুদি ধারে উঠ্‌না দিত, গোয়ালা ধারে দুধ যোগাইত। আসানসোল একেবারে নির্ব্বান্ধব দেশ; পকেট শূন্য। গোকুল স্থির করিল, আগে একখানি ভালো দেখিয়া বাড়ী ঠিক করিতে হইবে; সেই বাড়ীতে জাঁকাইয়া বসিয়া সকলের কাছে পসার করিয়া লইবে।

গোকুল বাজার ছাড়াইয়া আসিয়া দেখিল একখানি ছোট দোতলা বাড়ী, তাহার চারিদিকে পাঁচিল-ঘেরা হাতা এবং সেই হাতায় একটু বাগানের মতো রহিয়াছে। দেখিয়া তাহার লোভ হইল। বাড়ীখানি খালিই আছে, ভাড়া পাওয়া গেলেও পাওয়া যাইতে পারে। গোকুল অগ্রসর হইয়া দেখিল, একজন হিন্দুস্থানী চাকর চারপাইয়ের উপর বসিয়া পরম উল্লাসে গান করিতেছে—

"ভালো বাস্‌তে এসে কান্‌ব কেনে সই!"

গোকুল তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বাঃ জমাদারসাহেব! তুমি ত তোফা বাংলা গান করতে পার? এমন বাংলা তুমি শিখলে কেমন ক'রে?

হিন্দুস্থানীটা প্রথমে 'জমাদার' সম্বোধনে খুসী হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার উপর তাহার ভাষাশিক্ষার কৃতিত্বের প্রশংসা শুনিয়া একেবারে গদ্‌গদ্‌ হইয়া পড়িল। একমুখ দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হাঁ বাবু, অনেক দিন বাংলা মুলকমে থাকা করিয়েসে কিনা, উস্‌ লিয়ে বাংলা সিখিয়েসে। ইখানকার আদমি-সব বোলে কি —পরমেশ্বর, তুমি তো বাঙালী হোয়ে গেলো, তুমি তো বাঙালী হোয়ে গেলো!

গোকুল বলিল—হাঁ জমাদার-সাহেব, তুমি ত বহুত আচ্ছা বাংলা শিখেছ, গানও ত খুব সুন্দর করতে পার। তুমি গান কর, শুনি!

পরমেশ্বর একমুখ হাসিয়া চারপাইয়ের একপ্রান্তে সরিয়া বসিয়া বলিল—গান শুন্‌বেন ত বোসেন বাবু।

গোকুল বসিল। পরমেশ্বর দুই হাতে দুই কান চাপিয়া ধরিয়া গাহিতে লাগিল—

'ভালো বাস্‌তে এসে কান্‌ব কেনে সই!...'

গান শেষ হইলে গোকুল বলিল—বাঃ ক্যা তোফা গলা তোমার! আর কি সুন্দর গান!

পরমেশ্বর গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—হাঁ বাবু, গানঠো বহুত আচ্ছা আসে! ইয়ে হামি বহুৎ কোষ্টো কোরে সিখিয়েসে!

—আচ্ছা জমাদার-সাহেব তুমি বুঝি এই বাড়ীর বাবুর জমাদার?

পরমেশ্বর বলিল—হাঁ ইয়ে বাড়ী ত লখীকান্ত বাবুকে আসে, হামি ইখানকার বাগানের তদারক করি!

গোকুল বুঝিল যে, পরমেশ্বর জমাদার আসলে বাগানের মালী। গোকুল বলিল—লক্ষ্মীকান্তবাবু এই বাড়ীতেই থাকেন? কৈ, বাড়ীতে ত কোনো লোক দেখছি না?

—না, বাবু ই বাড়ীতে থাকে না, ঐ চৌরাহার পর যে বড় মোকান আসে, ঐ বাড়ীতে বাবু থাকে।

—তুমি একলা তবে এই বাড়ীতে?

—নেহি বাবু, হামরা-লোগই বাড়ীতে কোই থাকে না—ই বাড়ীমে বহুত ভূতের ডর আসে, সোন্‌ঝা হোয়, আউর হামরা সব ভাগি।

গোকুল আনন্দিত হইয়া বলিল—বল কি জমাদার-সাহেব। তবে ত আমাকে এই বাড়ীতে থাক্‌তে হল। আমি ভূতের ওঝা! বাবুকে বলে তুমি যদি ঠিক করে দিতে পার, তা হ'লে আমি ভূত ভাগিয়ে বাড়ী ভালো ক'রে দিতে পারি।

পরমেশ্বর তটস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আপনি গুণী আসে!... আলবৎ বাবুসে হামি বাড়ী দিলিয়ে দিব। এই বাড়ী ত এইসেই বন্‌ পড়ে থাকে।

গোকুলচন্দ্র পরমেশ্বরের সুপারিসে লক্ষ্মীকান্তবাবুর কাছ হইতে বাড়ীখানি দখল করিবার অনুমতি অতি সহজেই পাইল। বাড়ীতে ভয়ানক ভূতের ভয়, কেহ এ বাড়ী ভাড়া লইতে চায় না; গোকুলবাবুর ঝাড়ফুঁকে বাড়ীটার দুর্নাম যদি ঘোচে, তবে গোকুলবাবুকে বেশি কিছু ভাড়া দিতে হইবে না। প্রথম মাস বিনা ভাড়ায়, তারপরও টিকিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে এক বৎসর পাঁচ টাকা ভাড়ায় থাকিবেন; তারপর যাবৎ থাকিবেন, সাত টাকা ভাড়া কায়েমি রহিল।

গোকুল সানন্দে সেই বাড়ী দখল করিয়া বসিল। অমনি শহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, একজন খুব গুণী ডাক্তার লক্ষ্মীকান্তবাবুর ভূতুড়ে বাড়ী ভাড়া লইয়াছে। সে যখন ভূত ভাগাইতে পারে, তখন রোগ ভাগাইবে যে, তাহা এমন আর বেশি আশ্চর্য্য কি!

গোকুল পরমেশ্বরকে তাহার কাছে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল; পরমেশ্বর

ডাগডেরবাবুর ভূত ভাগাইবার মন্ত্রতন্ত্র শিখিতে পাইবার প্রলোভনেও সেই বাড়ীতে রাত্রিবাস করিতে কিছুতেই রাজি হইল না; অগত্যা গোকুলকে একাই থাকিতে হইল।

প্রথম রাত্রিতে ভয়ে ভয়ে গোকুলের ঘুম হইল না। প্রভাতে উঠিয়াই গোকুল দেখিল, সে বাঁচিয়া আছে কি না, ইহাই দেখিবার জন্য লক্ষ্মীকান্তবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ইতর-ভদ্র বহুলোক বাড়ীর বাহিরে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গোকুলের জাগরণক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ডাক্তারবাবু, খবর কি?

গোকুল বলিল—উঃ মশায়! সে ভয়ানক! ভাগ্যিস্ আমি বাড়ীর চৌহদ্দী-বন্দী করে ধুলোপড়া দিয়ে রেখেছিলাম, তাই আমি বেঁচে আছি।

লক্ষ্মীকান্তবাবু বলিলেন—তা হলে ত আপনি খুব বড় গুণী বলতে হবে। আমি অনেক টাকা খরচ করেছি মশায়, কিন্তু কোন গুণী এ বাড়ীতে এক রাত্তিরও বাস করতে পারেনি—কেবল এক মহেশপুরের কালীগুণী তেরাত্তির ছিল.....

তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবুকেও তেরাত্তিরের বেশি থাকিতে হইবে না।

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—আচ্ছা, দেখা যাক্!

একজন বলিল—শনি-মঙ্গলবার কেটে যাবে, তবে জানব যে, হাঁ, গুণী বটে!

গোকুল শুধু বলিল—কাল ত মঙ্গলবার। আচ্ছা, কাল একবার কলিকাতন্ত্রের পিশাচদাপন মন্ত্রটা দিয়ে ঘাটবন্দী করে নেওয়া যাবে।

দ্বিতীয় রাত্রি কাটাইয়া গোকুল দেখিল, সে বাড়ীতে এক ইঁদুরের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুরই উপদ্রব নাই। কেন যে সে-বাড়ীটার ভূতুড়ে অপবাদ হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তবে এইটুকু বুঝিতে পারিল যে, গুণীরা শুধু ভয়েই সে-বাড়ীতে থাকিতে পারে নাই। বাড়ীর ভিতর গরম ও ইঁদুরের হুটোপাটি হয় বলিয়া, সে রাত্রে খাটিয়া আনিয়া খোলা বাগানের মধ্যে তোফা নিদ্রা দিল।

বুধবার সকাল হইতে-না-হইতে গোকুলের বাড়ীর ফটকের সামনে লোকে লোকারণ্য! সকলে স্থির করিল, ভূতে খাটিয়াসুদ্ধ ডাক্তারবাবুকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ঘাড় মটকাইয়া চলিয়া গিয়াছে। সকলেই পরস্পরকে নিকটে গিয়া গোকুলের অবস্থা দেখিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ আর সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। এক পা আগাইয়া তিন পা পিছাইয়া যখন জনতা গোকুলের ফটকের কাছে কলরব করিতেছিল, তখন গোকুলের ঘুম ভাঙিল—গোকুল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। অমনি সকলে "বাবারে" বলিয়া ছুটিয়া পঞ্চাশ হাত পিছাইয়া গেল। যাহারা অসমসাহসী, তাহারা আবার অগ্রসর হইয়া গিয়া ডাকিল—ডাক্তারবাবু!

গোকুল অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আর মশায়! এ সর্ব্বনেশে বাড়ী! বাবা!

সকলে অমনি জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—কেন! কি হয়েছিল? খাটিয়া-সুদ্ধ টেনে...

গোকুল তাহাদের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—উঃ! একেবারে বাইরে এনে এক আছাড়!

—তারপর গলা...

—হাঁ,—গলা টেপে আর কি! এমন সময়ে গুরুর আশীর্বাদে কণ্ঠ-কণ্ডুয়ন মন্ত্র মনে পড়ে গেল। যেমন 'হুং হুং কঠ কঠ কণ্ডুয়ন' বলা, আর অমনি সব দুড়দাড় করে দিলে দৌড়—যেন সমস্ত পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে! অমনি আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম...

—সমস্ত মন্ত্রটা আর আওড়ানো হল না?

—না, কৈ আর হল? মূর্চ্ছায় একেবারে দাঁতকপাটি!

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তবে বাঁচলেন কেমন করে? ভূত ফিরে এল না?

গোকুল বলিল—ফিরবে কি! মন্ত্র যে মনে প'ড়ে গিছল, মনের মধ্যে ত সবটা জেগে উঠেছিল! আর, ধারালো মন্তরের গোড়ায় খোঁচাটা খেয়েই বাছাধনেরা মজা টের পেয়ে গেছেন; বুঝে গেছেন যে, আমার সঙ্গে চালাকি নয়!

ডাক্তারবাবুর খ্যাতি ও পসার হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিল। একে ডাক্তার, তায় গুণী, তায় ব্রাহ্মণ—রোগ হইলে কুইনিন-গোলা চিরেতার জল, মন্ত্রতন্ত্রের ঝাড়-ফুঁক, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সমস্তের জন্যই ডাক পড়ে গোকুল ডাক্তারকে। গোকুলের এখন রাজার হাল। কিন্তু এখনও সামনে শনিবার। শনিবার আবার অমাবস্যা। সেদিনটা ভালোয় ভালোয় উৎরিয়া গেলে তবে বোঝা যাইবে যে—হাঁ!

লক্ষ্মীকান্তবাবু শনিবার প্রাতে জিজ্ঞাসা করিলেন—ডাক্তারবাবু, কেমন বুঝছেন?

গোকুল বলিল—বুঝছি ত বড় সুবিধের নয়। তাতে আবার কপাল-কুণ্ডলিনী তন্ত্রখানা বাড়ীতে ফেলে এসেছি...

—তবে! আজ যে শনিবার!—

—তাই ত ভাবছি!...

—তাতে অমাবস্যা!

—তাই ত। তবু দেখা যাক, কতদূর কি হয়...

—না না, ডাক্তারবাবু অতটা সাহস করবেন না! ঠিক করে ভেবে দেখুন, তাল সামলাতে পারবেন ত?

গোকুল দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—আজ্ঞে, গুরুর

আশীর্বাদে আর মা-কালীর খাঁড়ার কৃপায় পারব ত মনে হচ্ছে। আজকে সন্ধ্যে-বেলা থেকেই কুলার্ণব-তন্ত্রের মতে পুরশ্চারণ করে ভূতশুদ্ধি আর ভূতাপসারণ করতে হবে।

লক্ষ্মীকান্তবাবু বললেন—হাঁ হাঁ, ঐ ভূতশুদ্ধির কথা যা বললেন, ওতে মহেশ-পুরের কালীগুণী খুব ওস্তাদ! তাকেও আনিয়ে নেওয়া যাক্, কি বলেন? আপনারা দু'জনে তবু একটা জোর বাঁধবে ত?

গোকুল প্রমাদ গণিল। গুণী আসিয়া তাহার গুণ সমস্ত ফাঁস করিয়া না দেয়! তথাপি মুখে বলিল—তা বেশ ত! আপনার আনতে ইচ্ছা হয়, আনুন; কিন্তু কিছু দরকার ছিল না।

লক্ষ্মীকান্তবাবু বলিলেন—তা হোক ডাক্তারবাবু, কথায় বলে সাবধানের বিনাশ নেই। আজকে যে বড় ভয়ানক দিন!

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—তা বটে! কিন্তু কালীগুণী কি খুব জবর গুণী?

লক্ষ্মীকান্তবাবু বলিলেন—উঃ, বলেন কি? তাঁর টিকিতে জট! তিনি বাঁ-হাতের তিন আঙ্গুলে ধ'রে মড়ার মাথার খুলিতে মদ খান।

গোকুল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল...ওঃ! তবে ত মস্ত গুণী।

বিকেল নাগাদ কালীগুণী আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মীকান্তবাবুর বৈঠকখানায় গোকুলের ডাক পড়িল। গোকুল গিয়া দেখিল, এক-বৈঠকখানা লোকের মধ্যে একজন লোক বসিয়া আছে, সে গুণী না হইয়া যায় না—তাহার দুই হাতে দুই তামার তাগায় আঠারো গণ্ডা মাদুলি; তাহার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হিংলাজের মালা, হাড়ের মালা, স্ফটিকের মালা, মুসলমান ফকিরের তসবীমালা; তাহার প্রত্যেকটাতে এক-একটা মাদুলি, একটা তামা-বাঁধানো আমড়ার আংটি, একটা আংটি, সুতায় জড়ানো নানাবিধ জড়ি-বুটি; তাহার কোমরের ঘুন্‌সিতে একটা ঘসা পয়সা, তিনকড়া কাণা-কড়ি, একটা নাভিশঙ্খ, একটা কুমীরের দাঁত, একটা বাঘের নখ, আর তার সঙ্গে গোটাকতক মাদুলি ঝুলিতেছে; তাহার মাথার টিকিটি একটি জট, তাহার শেষ প্রান্তে একটি মাদুলি জটের পাকে কায়েমি হইয়া আটকাইয়া রহিয়াছে; তাহার পরণে লাল চেলী, কাঁধে লাল চেলীর উত্তরীয়, কপালে রক্ত-চন্দন ও সিঁদুরের ফোঁটা।

গোকুল দেখিল, কালীগুণী লক্ষ্মীকান্তবাবুর হাত দেখিতেছে। লক্ষ্মীকান্ত-বাবু বলিলেন—আসুন ডাক্তারবাবু, গুণীকে আপনার হাতটা একবার দেখান।

গোকুল উহাকে গুণী বলিয়া স্বীকার না করিবার জন্য তাহাকে গুণী না বলিয়া বলিল—কালীপদবাবু কি-মতে হাত দেখেন?

কালী একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—কি-মতে দেখি, তা আপনি কি বুঝবেন? আপনি কি এ শাস্ত্র কিছু আলোচনা করেছেন?

গোকুল বলিল—তা-একটু-আধটু করেছি বৈ কি!

লক্ষ্মীকান্তবাবু বলিলেন—আপনি গুণতে পারেন, তা ত আমাদের এতদিন বলেননি?

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—নিজের বিদ্যের কথা কি নিজের মুখে বলতে আছে?

লক্ষ্মীকান্তবাবু, তাড়াতাড়ি আপনার হাত কালীর হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া গোকুলের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু, আমার হাতটা একবার দেখুন।

কালী গোকুলের উপর মনে মনে চটিল। গোকুল লক্ষ্মীকান্তবাবুকে বলিল—হাত দেখতে হবে না, আমি এমনিই বলে যাচ্ছি।

লক্ষ্মীকান্তবাবুর শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

কালী বলিল—ওঃ! আপনি হনুমান-চরিত্র, কাক-চরিত্র-মতে গোণেন দেখছি।

গোকুল বলিল—আপনি জানেন?

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল—হ্যাঁ, জানি বটে, তবে ততটা অভ্যাস নেই।

গোকুল লোক-পরম্পরায় লক্ষ্মীকান্তবাবুর সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনিয়াছিল, তাহাই আবছা আবছা অস্পষ্ট করিয়া বলিয়া ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ, সম্পত্তি-বিপত্তির খুব একটা লম্বা ফর্দ্দ নির্ভয়েই দিয়ে গেল।

গোকুলের বিদ্যা দেখিয়া লক্ষ্মীকান্তবাবু ত অবাক্! কালীরও কৌতূহল হইল, অনুরোধ করিল যে, তাহারও অদৃষ্ট গণিয়া বলিতে হইবে।

গোকুল প্রমাদ গণিল—এবার বুঝি সকল বিদ্যা ফাঁস হইয়া যায়!

গোকুল বলিল—গুণীলোকের অদৃষ্ট বলা বড় শক্ত! তাঁরা নিজের বিদ্যার প্রভাবে হয়কে নয়, আর নয়কে হয় ক'রে তোলেন কিনা! বিশেষ এ'কে দেখছি জবর গুণী!

কালী খুসী হইয়া গেল। তথাপি লক্ষ্মীকান্তবাবু ও সে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল—তবু দেখুন, সব না মিলুক, কিছু ত মিলবে।

গোকুল আবার ওজর করিল—জানেন ত গণনা প্রভাতে জল ছোঁবার আগে যেমন হয়, ভরাপেটে তেমন হয় না!

কালী বলিল—হাঁ, তা বটে। তবু...

তবুর পর গোকুলের আর এড়াইবার উপায় রহিল না। গোকুল চোখ পাকাইয়া কালীর দিকে কটমট করিয়া চাহিল। কালীর দৃষ্টি অমনি নত হইয়া পড়িল। গোকুল বুঝিল, সে ভীরু ও দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক—উহাকে ধমকাইয়া অনেক কাজ হাঁসিল করা যাইবে। গোকুল ধমকাইয়া বলিল—আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন।

কালীর চোখ মিটমিট করিতে লাগিল। গোকুল শুনিয়াছিল যে, কালীগুণী গয়লার বামুন, গয়লা-পাড়াতেই তাহার বাস। তাই আন্দাজে গোকুল বলিল—একবার ছেলেবেলায় আপনার একটা খুব বড় ফাঁড়া গেছে, ভাগ্যে ভাগ্যে বেঁচে গিছিলেন; একটা গরু আপনাকে গুঁতোতে এসেছিল—

—হাঁ ঠিক, মা কোলে তুলে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন।

গোকুল বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ! আপনি বলছেন কেন, ও ত আমিই বলব!

সকলের মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

গোকুল আবার খানিকক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া বলিল—একবার উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে খুব আঘাত পেয়েছিলেন...

—আজ্ঞে হাঁ, গাছ থেকে...

গোকুল আবার ধমক দিয়া বলিল—আঃ! আবার বলছেন, ও ত পরে আমিই বলব।

কালী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আচ্ছা, বলুন দেখি কি গাছ?

গোকুল মুস্কিলে পড়িয়া গেল। একটু চোখ পাকাইয়া ভাবিয়া বলিল—সে-গাছে ব্রহ্মদত্যি ছিল, গাছে পা ঠেকাতে...

কালী উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—হাঁ, ঠিক বটে, সেটা বেলগাছ।

গোকুল আবার ধমক দিয়ে বলিল—আঃ! আমাকে বলতে দিচ্ছেন কই? গাছের নাম ত আমি বলতে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, অতীতের গণনা দেখে বিশ্বাস হ'ল ত? এখন বর্ত্তমান বলি।...আপনার বর্ত্তমান সময়টা তেমন ভালো যাচ্ছে না...

মানুষ প্রায়ই বর্ত্তমানে সুখী থাকে না; সে অতীতের ও ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কেবলই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে থাকে। ইহা ভাবিয়াই গোকুল বলিল—আপনার বর্ত্তমান সময়টা তেমন ভালো যাচ্ছে না...

কালী অমনি বলিয়া উঠিল—হাঁ, ঠিক বলেছেন, আমি ভারী ঝঞ্ঝাটের মধ্যে মনের অসুখে আছি।

এক-বৈঠকখানা লোক সকলেই ডাক্তারবাবুর অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। সকলে মনে মনে আঁচিয়া রাখিতেছিল, এই গুণী ডাক্তারবাবুটি ছাড়া আর কাহাকেও দিয়া চিকিৎসা করানো নয়।

কালী বলিল—তারপর?

গোকুল মুখ ঘুরাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তারপর? আজকে... থাক্, সে আর শুনে কাজ নেই।

সকলের কৌতূহল একেবারে উৎসুক হইয়া উঠিল। সকলেই ব্যাপার কি জানিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। গোকুল অনেক ইতস্ততঃ করিয়া যেন অগত্যা বলিল—আজকে একটা বিশেষ রকম ফাঁড়া আছে দেখছি। আপনি পূর্ব্ব-জন্মে যে জানোয়ার ছিলেন, সেই ভূত আজকে আপনাকে তাড়া করবে।

কালীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। তবু সে ক্ষীণস্বরে বলিল—পূর্ব্বজন্মের কথা আপনি কোন্ শাস্ত্রের নির্দ্দেশে বলছেন? সে-রকম কি কোনো শাস্ত্র আছে?

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—আপনি গুণীমানুষ, আপনিই বলুন, সে কোন্ শাস্ত্র?

কালী বলিল—হাঁ, গুরুদেব বলতেন বটে, এই রকম শাস্ত্র আছে, যাতে ক'রে পূর্ব্বজন্মে কে কি ছিল, আর পরজন্মে কে কি হবে, তা বলা যায়। আপনি কি সে-শাস্ত্র দেখেছেন?

গোকুল বলিল—দেখেছি বৈ কি! আমার গুরু তিব্বত থেকে সে-শাস্ত্র এনেছিলেন। তার নাম ঘটোদ্ঘাটিনী অদৃষ্টোৎসারিণী তন্ত্র।

কালী বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ, গুরুদেব ঐরকম একটা প্রকাণ্ড কটমট নাম করতেন বটে!

তখন সকলে জেদ করিতে লাগিল—বলিতে হইবে কালীগুণী পূর্ব্বজন্মে কি ছিলেন, পরজন্মে কি হইবেন।

কালীর মুখ চুন হইয়া গিয়াছে। সে আর কোনো কথা বলে না। তাহা দেখিয়া গোকুলের একটু দয়া হইল, সে বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আবার সকলে জেদ করায় গোকুল বলিল—এত লোকের সামনে...

লক্ষ্মীকান্তবাবু বলিলেন—লোকের সামনে বলতে কি শাস্ত্রে নিষেধ আছে?

—না, শাস্ত্রে ঠিক নিষেধ নেই; তবে...

তখন সকলে কলরব করিয়া উঠিল—তবে আর কি? আপনি বলুন।

গোকুল যথাসাধ্য চেষ্টায় খুব গম্ভীর হইয়া বলিল—গুণী পূর্ব্বজন্মে গরু ছিলেন, আর-একটা গরুকে গুঁতিয়ে মেরে ফেলেছিলেন; সেইজন্য তিনি গয়লার বামুন হয়ে জন্মেছেন; আর সে ভূত হয়ে শনিবারে অমাবস্যার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে!

লক্ষ্মীকান্তবাবু বলিলেন—আজই ত শনিবার অমাবস্যা!

কালী বলিল—গো-ভূত! সে যে ভয়ানক! সে আবার মন্তর মানে না!

গোকুল তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল—ভয় কি, আমি আছি!

তখন সকলে আশ্বস্ত হইয়া কালীগুণীর পরজন্ম শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—আপনি কোনো ধোপাকে মেরেছেন বা মারবেন...

কালী ভীত হইয়া বলিল—হাঁ, মেরেছি বটে! এই পরশু। কেন, কি হবে বলুন দেখি?

গোকুল বলিল—আপনি আসছে জন্মে গাধা হয়ে জন্মাবেন।

সভা একেবারে অবাক্, নিস্তব্ধ!

গোকুল হাসিয়া মনে মনে বলিল—আর এ-জন্মে এখানকার সব কয়টিই গাধা হয়ে জন্মেছেন দেখতে পাচ্ছি!

গোকুলের এই বিদ্যা জাহির হইবার পর আর কেহ গোকুলকে নিজেদের অদৃষ্ট-গণনা করিতে অনুরোধ করিতে সাহস করিল না। কে যে বানর ছিল এবং কে যে হনুমান হইবে, তাহা জানিতে বড় কাহারো উৎসাহ দেখা গেল না।

সভার কেহ কথা কহে না দেখিয়া গোকুল কথা পাড়িল; চিন্তা করিয়া কাহাকেও তাহার গণনা-শক্তির গূঢ় উপায়টি ধরিতে দিতে সে চায় না। সে বলিল—তারপর গুণীমশায়; আজকের কি ব্যবস্থা করেছেন?

কালী বলিল—মনে করছি কুলাকুল-চক্রের উপর ভূতাপসারিণী হোমটা করব। কি বলেন আপনি?

গোকুল বলিল—হাঁ, সেটা ত করতেই হবে, ঠিক আমিও ঐ কথাটি আপনাকে বলব ভাবছিলাম। আপনি ত তা' হলে মস্ত গুণী। এতক্ষণে আমি আপনার পরিচয় পেলাম। ও-হোম ত যে-সে লোকে করতে জানে না, পারেও না, করতেও নেই...

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল—হাঁ, তন্ত্রে নিষেধ আছে।

গোকুল বলিল—হাঁ, আছেই ত।...আচ্ছা, আমি বলি কি ঐ সঙ্গে অকড়ম-চক্রে বসে পিশাচ-বিদ্রাবণ মন্ত্রটা জপ করলে হয় না?

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল—হাঁ হাঁ, অতি উত্তম! আমি হোম করব, আপনিই মন্ত্রটা জপ করবেন।

গোকুল বলিল—আচ্ছা, তাই হবে। আমাকে ত আবার গো-ভূত-বিতাড়িনী মন্ত্রটাও জপ করতে হবে। একটা গো-ভূত-বিঘট্টিনী কবচ লিখে আপনার টিকিতে বেঁধে দেবো।

কালীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল! তাহা দেখিয়া গোকুল তাড়াতাড়ি বলিল—একটা আমাকেও ধারণ করতে হবে।

কালী বলিল—আপনার ত শিখা নেই দেখছি।

গোকুল বলিল—আমার গুরুসম্প্রদায় নিঃশিখ।

কালী বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—ও! আপনারা তাহ'লে তিব্বতীয় আশ্রমের!

গোকুল হাসিয়া বলিল—আপনার দেখছি সমস্ত খবরই জানা আছে।

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল—শ্রীগুরুর প্রসাদে।

গোকুল ভূত তাড়াইবার অনুষ্ঠানের একটা খুব লম্বাচৌড়া ফর্দ্দ করিয়া দিল এবং সেই ফর্দ্দ কালীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল,—গুণীমশায়, দেখুন, কিছু ছাড়-টাড় হল কি না?

কালী ফর্দ্দে একবার চোখ বুলাইয়াই বলিয়া উঠিল—করেছেন কি? আসল জিনিষই ভুল!

গোকুল বলিল—কি মশায়?

কালী বলিয়া উঠিল—কারণ!

গোকুল হাসিয়া বলিল—ওঃ! ও জিনিষটা আমাদের গুরুসম্প্রদায়ে চলে না কি না...

কালী বলিয়া উঠিল—ঠিক ঠিক, আপনারা যে তিব্বতী সম্প্রদায়। আপনারা ঘৃতাভ্যঙ্গ চায়ের ক্বাথ পান করেন বটে! কিন্তু চা-ও ত ফর্দ্দে ধরেন নি!

গোকুল বলিল—চা আমার বাসায় আছে, ও নেশাটা আমাকে নিয়মিত দুবেলাই করতে হয়, নইলে মন্ত্র জাগ্রত থাকবে কেন?

কালী বলিল—হাঁ, চা খেলে ঘুম আসে না বটে! কিন্তু...আমার জন্যে এক বোতল কারণ ফর্দ্দে ধরে দিন। আমরা শব-সাধনা করি কিনা, কারণটা আমাদের নইলে নয়...

গোকুল—তা অবশ্য—বলিয়া ফর্দ্দে এক বোতল কারণ লিখিয়া দিল, এবং বলিল—লক্ষ্মীকান্তবাবু, কারণটা আমি নিজে কিনব; যে-সে জিনিষ ত পুজো-আর্চ্চায় চলে না!

গোকুল নিজে গিয়ে খুব কড়া রকমের এক বোতল মদ কিনিয়া আনিয়াছিল এবং হোম করিতে করিতে কালীগুণীকে ঢালিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল। কালী বাঁ-হাতের মাঝের দুটি আঙুল মুড়িয়া কনিষ্ঠা, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলিতে একটি তেপায়া বৈঠক করিয়া তাহার উপর মদের ছোট বাটিটি বসাইয়া পান করিতেছিল। তাহা দেখিয়া গোকুলের ভারি কৌতুক বোধ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—গুণী-মশায়, ওরকম ক'রে খাচ্ছেন যে?

কালী একটু অবজ্ঞার স্বরে বলিল—আপনাদের গুরু-সম্প্রদায়ের ত এসব নেই, জানবেন কোত্থেকে? ডান হাতে ক'রে খেলে, কিংবা সোজা আঙুলে ধরে খেলে যে, মদ খাওয়া হয়। মদ ত আমরা খাই না। বাঁ-হাতের তিন আঙুলের ডগায় বসিয়ে খেলে হয় কারণ, আমরা কারণই পান ক'রে থাকি!

গোকুল বলিল—বেশ! একটা নতুন তত্ত্ব শেখা গেল। বড় ভাগ্যে আপনা-হেন গুণীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমাকে দয়া ক'রে কিছু গুণ-টুন শিখিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

কালী উৎফুল্ল হইয়া বলিল—তা বেশ! কিন্তু জানেন ত শিবের গুরু রাম, আর রামের গুরু শিব!

গোকুল হাসিয়া বলিল—তা অবশ্য! তা অবশ্য! আমার একটু-আধটু যা জানা আছে, আপনাকে শিখিয়ে দেবো বৈকি! কিন্তু ভালোয় ভালোয় আজকের রাতটা ত কাটিয়ে উঠি।

কালী আড়চোখে একবার চারিদিকে দেখিয়া লইল! ইহা গোকুলের চোখ এড়াইল না।

গোকুল আবার পাত্রপূর্ণ করিয়া দিল। কালী বলিল—অত ঘন ঘন না হে!

গোকুল বলিল—বলেন কি? প্রত্যেক কুশীর ঘিয়ের আহুতি যেমন হোমানলে পড়বে, অমনি এক-এক পাত্র জঠরানলে পড়বে, এই ত নিয়ম। দেখুন না, আমার জপের সুমেরু হবে এক বাটি চা!

কালী খেলো হইয়া যাইবার ভয়ে আর কিছু বলিতে পারিল না; কিন্তু সে বুঝিতেছিল যে, মদের নেশাটা মাথার মধ্যে চন্‌চন্‌ করিয়া চড়িয়া উঠিতেছে।

খুব আড়ম্বরে জপ-হোম শেষ হইল। তখন গোকুল বলিল—এইবার সর্ষেপড়া দিয়ে বাড়ীটার ঘাটবন্দী ক'রে দিয়ে আসি।

কালীর গা তখন ছম্‌ছম্‌ করিতেছিল। সে একলা থাকিতে হইবার ভয়ে বলিল—হাঁ চল, আমিও ধুলোপড়া দিয়ে রেখে আসি।

ঘাটবন্দী করিবার জন্য বাড়ীর চারিদিকে ধুলা ছড়াইতে ছড়াইতে কালী খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্র আওড়াইতে লাগল—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তার স্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥
ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥

ঘাটবন্দী করিয়া আসিয়া দু'জনে খাটে মশারি খাটাইয়া শয়ন করিল। গোকুল দেখিল, অত মদ খাওয়া সত্ত্বেও কালী ভয়ে ঘুমাইতে পারিতেছে না। গোকুল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া কালী ঘুমাইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য আস্তে ডাকিল—গুণীমশায়!

কালী একেবারে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—অ্যাঁঃ! কেন? কি হয়েছে?

গোকুল বলিল—আজ আর ওঁরা কেউ এলেন না দেখছি!

কালী চাপা গলায় বলিল—চুপ, এখনো বলা যায় না, তৃতীয় প্রহরেই ওঁদের বেশী উৎপাত।

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গোকুল ডাকিল—গুণীমশায়!

কালী আবার লাফাইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—কেন? কি হল?

গোকুল কোনোমতে হাসি চাপিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি একবার বাইরে যাব।

কালীর তখন নেশায় শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে! সে শুইয়া পড়িয়া বলিল—আঃ! তোমার এত ভয়! যাও, কিছু ভয় নেই, আমি শরীর-সংরক্ষিণী মন্ত্র পড়ছি! কিন্তু খবরদার, দশরথের বেটার নাম করো না যেন; তাহ'লে ওঁরা ভারি রাগ করেন, তখন একটু অসাবধান হলেই ঘাড় মট্‌কান!

গোকুল মহাভয়ের ভান করিয়া বলিল—অ্যাঁঃ! বলেন কি? আমি যে মন্তর-তন্তর সব ভুলে যাচ্ছি...

কালী জড়িতস্বরে বলিল—ভয় নেই। হুং হুং হ্রীং বৌং শ্রুং ক্রং কট্‌কট্‌ ফট্‌ফট্‌ তারয় তারয়—বল্‌তে বল্‌তে চ'লে যাও।

গোকুল রুদ্ধহাসির বেগে কম্পিতস্বরে মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে বাহিরে চলিয়া গিয়া আর হাসি চাপিতে পারিল না, হো হো করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল! সে-হাসি শুনিয়া কালী একেবারে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল।

গোকুল ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—গুণীমশায়, ব্যাপার কি?

কালী কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—বিকট হাসি শুন্‌তে পেলে না?

গোকুল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—কৈ, না ত!

কালী বলিল—এইবার আসছেন তাঁরা! খুব সাবধান! বৌং ক্রৌং যং রং লং বং শং ষং সং হো হং সঃ কট্‌কট্‌ ফট্‌ফট্‌ তারয় তারয়...

গোকুলের হাস্যরোধ করা কষ্টকর হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে গোকুল দেখিল কালীর নাক ডাকিতেছে, কালী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গোকুল বাহিরে গিয়া গোটাকতক ঢিল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সেই ঢিলগুলি একসঙ্গে মুঠা করিয়া জোরে ছুড়িয়া ফেলিল। একটা ঢিল দরজার শিকলে লাগিয়া শব্দ হইল—টুং!

কালী একবারে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিল—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

গোকুল ঘুমের ভান করিয়া জবাব দিল না। কালী বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

গোকুল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—অ্যাঁ, কি?

কালী বলিল— শিয়রে শমন ক'রে ভালো ঘুম আপনার যা হোক্‌! ওঁরা যে এসেছেন!

গোকুল বিস্ময়ের ভাবে বলিল—এসেছেন কি?

—হাঁ, দরজার শিকল খুলেছেন...

—না, ও ইঁদুরে মাটি ফেলেছে বোধ হয়।

—ইঁদুর নয় হে, ইঁদুর নয়, শিকল খোলার শব্দ স্পষ্ট শুনলাম!

—নাঃ, ও কিছু নয়; আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকুন! আর ত কিছু শোনা যাচ্ছে না!

—তা হোক্‌ মন্তরটা আওড়াও হে। ওঁ ভূতশৃঙ্গাটচ্ছিরঃ সঙ্কোচশরীর-মুল্লস জ্বল জ্বল.....

—আচ্ছা গুণীমশায়, ওটা কিসের মন্ত্র? গো-ভূত-তাড়ান মন্ত্র কি?

—হাঁ, দেখছ না মন্ত্রের শৃঙ্গ রয়েছে।...ভূতশৃঙ্গাটচ্ছিরঃ সঙ্কোচশরীর-মুল্লস...

গোকুল বলিল—আপনার টিকিতে সে-কবচটা ঝুলছে ত!

—তা ত ঝুলছে! জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল.....

—তবে আর কোন ভয় নেই।

কালী বলিল—তুমি ত বল্‌লে ভয় নেই, কিন্তু ওঁরা ত এসে ঘুরঘুর করছেন।... দহ দহ শোষয় শোষয়...

কালীর ঘুম আর আসে না। গোকুলও ভূত নামাইবার সুবিধা আর পায় না। অপেক্ষা করিতে করিতে কখন গোকুল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙিল, তখন দেখিল একেবারে ভোর হইয়া আসিয়াছে। কালীর তখনো খুব নাক ডাকিতেছে। গোকুল আস্তে-আস্তে মশারি তুলিয়া খাট হইতে নামিয়া 'হুড়্‌ড়্‌ড় বাঁ' করিয়া বিকট চীৎকার করিয়া লাফাইয়া গিয়া কালীর মাথাটা জোরে চাপিয়া ধরিল! কালী মুখে একটা 'বু উঁউঁউঁ.....শব্দ করিয়া সমস্ত মশারি ছিঁড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া লইয়া একলাফে সিঁড়ির উপরে গিয়া পড়িল, এবং সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে গিয়া একেবারে নীচে খোয়ার উপরে আছাড় খাইল; তাহার জটওয়ালা টিকিটি গোকুলের হাতের মুটার মধ্যেই ছিঁড়িয়া রহিয়া গিয়াছিল!

ভোর হইতে-না-হইতেই লক্ষ্মীকান্তবাবু লোকজন লইয়া বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ভূতের অধিকারে পা দেওয়া ত অমনি নয়!

কালীগুণীকে পড়িয়া গোঁ-গোঁ করিতে দেখিয়া দু-একজন অসমসাহসিক লোক ইতস্ততঃ করিতে করিতে ধীরে ধীরে দু'পা আগাইয়া এক-পা পিছাইয়া গিয়া তাহাকে উঠাইয়া হাতার বাহিরে আনিল। বেচারার টিকি ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেছে, মুখের একপাশ খোয়ায় আছাড় খাইয়া থেঁৎলাইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত।

সকলে তাহার মুখে চোখে জল দিয়া বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—গুণী, ব্যাপার কি?

কালী বলিল—উঃ রে বাবা! কী ভয়ানক! একটু ঘুমিয়ে পড়েছি; যেই মন্তর পড়া বন্ধ হয়েছে, সেই তক্কে একটা আস্ত গো-ভূত একদম তেড়ে এসে চেপে ধরলে আমার টিকিটা! ঐ হতভাগা ডাক্তারটাই ত যত নষ্টের গোড়া! টিকিতে বেঁধে দিয়েছিল কি না গো-ভূত খেদানো কবচ! যত আক্রোশ পড়ল এসে টিকিটার ওপর! আচমকা ঘুম ভেঙে যেতেই অমনি আওড়ে দিলাম 'হুং হুং বৌং ক্রৌং'। তখন আর আমার কিছু করতে না পেরে মশারিসুদ্ধ আমায়-জড়িয়ে-সড়িয়ে তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ওপর থেকে একেবারে নীচে...

সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—আর ডাক্তার?

হ্যাঁ! ডাক্তার! তাকে কি আর রেখেছে? আমি যাই, তাই কোনো গতিকে প্রাণে বেঁচে এসেছি!

—তাহ'লে ত তাকে একবার দেখা উচিত। বিদেশী লোকটা গোঁয়াতুর্মি করতে গিয়ে বেঘোরে মারা গেল গা!

তখন সকলে লম্বা লম্বা বাঁশের লাঠির ডগায় লণ্ঠন বাঁধিয়া লইয়া সন্তর্পণে

সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা সকলের পশ্চাৎ থাকিবে। কালীর ভয় করা শোভা পায় না, তাই তাহাকে প্রাণ হাতে করিয়া সকলের আগে আগেই যাইতে হইতেছিল; সে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জোরে জোরে মন্ত্র পড়িতেছিল— হন হন দম দম পচ পচ মর্দ্দয় মর্দ্দয়...

সকলে ঠেলাঠেলি করিতে করিতে সিঁড়িতে উঠিতেছে টের পাইয়া গোকুল তাড়াতাড়ি কালীর টিকিটি সিঁড়ির দরজার মাথার চৌকাঠে শিকলের শুর্ষোতে ঝুলাইয়া দিল এবং আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া রুদ্ধহাসির চোটে অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল।

এতক্ষণে গোলমাল শুনিয়া পাড়া-পড়শী সকলে আসিয়া জুটিয়াছে। তাহারা সকলে একবাক্যে সাক্ষ্য দিল, কাল রাত্রে তাহারা ভূতের বিকট হাসি, উৎকট চীৎকার, হুটোপুটি শুনিয়াছে; এমন উপদ্রব এ বাড়ীতে আর কখনো হইতে দেখা যায় নাই।

সকলে উপরে উঠিয়া সিঁড়ির দরজার ওপার হইতে লম্বা লাঠি বাড়াইয়া বাড়াইয়া গোকুলের মশারির চারিদিকে লণ্ঠন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহার অবস্থা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কেহই সাহস করিয়া সে-ঘরে পা দিতে পারিতেছিল না; তখনো ঘরের মেঝেতে হোমের পূজার চিহ্ন ছড়াইয়া পড়িয়া থাকিয়া সকলের মনে ভয় জমাইয়া তুলিতেছিল।

কালী বলিল—দেখছ কি? এই দেখ, আমার টিকিটা এখনো ঝুলছে! আর ডাক্তার? ও হয়ে গেছে। দেখছ না, ও কি রকম কাঁপছে! ভূত-প্রেত-পিশাচ কি রোগী রে বাপু, যে, ওষুধ গিলিয়ে তাকে মারবে! এ যে একেবারে মরা জিনিষ! ...ওঁ হর হর কালী ধম ধম বিদ্যে আলে মালে তালে গন্ধে বন্ধে পচ পচ মথ মথ...

একজন চৌকাঠের এপার হইতেই ঘরের মধ্যে একটু ঝুঁকিয়া ভয়ে ডাকিল— ডাক্তারবাবু!

গোকুল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল—অ্যাঁ!

অমনি "ওরে বাবারে!" বলিয়া চীৎকার করিয়া সকলে দুদ্দাড় শব্দে একছুটে পলাইয়া একেবারে রাস্তায়!

নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে গোকুলের পেটে ব্যথা ধরিয়া গিয়াছিল। অনেক কষ্টে একটু দম লইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সে নীচে নামিয়া চলিল।

নামিতে নামিতে দেখিল, ডগায় লণ্ঠন-বাঁধা লাঠিগুলি বাড়াইয়া ধরিয়া সকলে গুটিগুটি আবার অগ্রসর হইতেছে। গোকুল ডাকিল—গুণী!

কালী হাতজোড় করিয়া বলিল! থাক বাবা—থাক! তোমায় ত আমরা কিছু বলিনি, তোমার ভালোর জন্যেই আমরা তন্ত্রমন্ত্র করছিলাম! থাক বাবা! তুমি থাক!...দ্রাবিড়ি দ্রাবিড়ি জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল...

গোকুল থামিয়া বলিল—আমি মরে ভূত হইনি গুণীমশায়! আমি জ্যান্তই আছি।

কালী মাথা নাড়িয়া বলিল—জ্যান্ত! জ্যান্ত তুমি থাকতেই পার না! আমার সঙ্গে ত চালাকি খাটবে না বাবা! থাক, থাক! তোমায় আমি কিছু বলিনি। এই চলে যাচ্ছি বাবা! থাক, থাক!...জাজ্বলি যমঘণ্টে তারয় তারয়...

গোকুল হাসিয়া বলিল—ঐ দেখুন; সূর্য্য উঠেছে। সূর্য্য উঠলেও কি ভূত দেখা দেয় নাকি?

তাও ত বটে! তখন সকলের প্রত্যয় হইল গোকুল ভূত হয় নাই, জ্যান্তই আছে।

গোকুল বলিল—এ বাড়ীকে এক বৎসর শোধন না করলে দোষ কাটবে না। ফি শনিবারে আর অমাবস্যায় শোধন করতে হবে!

লক্ষ্মীকান্তবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন—তাই করুন ডাক্তারবাবু! আপনার খাই-খরচের আর পুজো-আর্চ্চার সমস্ত ভার আমার। আপনি এক বছর ধরে শোধন ক'রে আমার বাড়ীটার দোষ কাটিয়ে দিন।

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—তাহ'লে গুণীমশায়, আসছে শনিবার আসছেন ত?

কালী মুখ ঘুরাইয়া দুই হাত তুলিয়া ঘন ঘন নাড়িয়া বলিল—আমি? আমি আর এ'দের ঘাঁটাতে আসছি না ডাক্তারবাবু!

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—তা না আসুন, এ কাজ আমি একলাই আরো ভালো পারব।

এ কথায় কাহারোই অবিশ্বাস হইল না যে ভূতে কালীগুণীকে দোতলা হইতে তুলিয়া আছাড় দেয়, তাহার হাতেও যখন গোকুল নিস্তার পাইয়াছে, তখন সে বড় গুণীই বটে!

গোকুলের পসার কায়েমি হইয়া গেল।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে।

সে-সময় মসলা-পোস্তায় গঙ্গাধর কুণ্ডুর ছোটখাটো একখানা মসলার দোকান ছিল।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলী জেলা, চাঁপাডাঙ্গার কাছে। অনেকদিনের দোকান, যে-সময়ের কথা বলছি, গঙ্গাধরের বয়স তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভাল যাচ্ছিল না। নানা রকম অসুখে ভুগত প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুসড়ে পড়েছিল। দোকান-ঘরের ভাড়া দু'মাসের বাকী, মহাজনের দেনা ঘাড়ে—দুপুরবেলা দোকানে বসে থেলো হুঁকো হাতে সে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধ্যার সময় গোমস্তা আসবে ভাড়া নিতে ব'লে শাসিয়ে গিয়েছে। কি বলা যায় তাকে।

এক পুরাণো পরিচিত মহাজনের কথা তার মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারী মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল

তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েছে, শোধও করেছে—কিন্তু সুদের হার বড় বেশী ব'লে ইদানীং বছরকয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায়নি!

ভেবে-চিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হলো। সুদ বেশী ব'লে আর উপায় কি? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধ্যার মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে, গল্পগুজব করতে দেরী হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হন্ হন্ ক'রে হেঁটে আসছে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে ডেকে বল্লে—এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জেরা—

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে, সেখানে কতকগুলো গাছপালায় বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জ্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েছে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হলো, এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এল। ওই গাছগুলোর তলায় সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের ওপর পড়েছে, মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। পরনে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে সুর নীচু ক'রে হিন্দীতে ও বাংলায় মিলিয়ে বল্লে—বাবু, সস্তায় মাল কিনবেন?

গঙ্গাধর আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—কি মাল?

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বল্লে—এখানে কথা হবে না বাবু, পুলিশ ঘুরছে, আমার সঙ্গে আসুন—

ঝুপ্‌সি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বল্লে—জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট্ মাল—লুকিয়ে দেবো।

গঙ্গাধর চম্‌কে উঠ্‌লো!

সে কখনো ও-ব্যবসা করেনি। ডিউটি-ছুট্ কোকেন—কি সর্ব্বনেশে জিনিস! ভাল লোকের পাল্লায় পড়েছে! না, সে কিনবে না।

লোকটা সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী মুসলমান! বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। সে অনুনয়ের সুরে বল্লে—বাবু, আপনি নিন্। আপনার ভাল হবে! সিকি কড়িতে দেবো—আমার মুস্কিল হয়েছে, আমি মাল বিক্রির লোক খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারিনে, পুলিশের ভয় তো আছে। কেউ কথা কইছে না আমার সঙ্গে, সেই হয়েছে আরও মুস্কিল। হঠাৎ সহরে এত পুলিশের ভয় হলো যে কেন বাবু, তা বুঝিনে—আগে যারা এ-ব্যবসা করতো, তাদের কাছে যাচ্ছি। তারা আমার দিকে চেয়েও দেখছে না। আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন, পরে দামদস্তুর হবে।

লোকটার গলার সুরে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজল!—

কোকেনের ব্যবসাতে মানুষে রাতারাতি বড়মানুষ হয়েছে বটে! বিনা সাহসে, বিপদ এড়িয়ে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক্ না!

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখলে যে, লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়ে ছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে, এই ভয়ে বেশী জোরে ডাকতেও সাহস পেল না! চাপা গলায় বাঙ্গালা হিন্দিতে ডাকলে—কোথায় গিয়া ও খাঁ-সাহেব! এদিকে-ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁ-সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বল্লে—জলদি বলো, রাত হো গিয়া। অনেক দূর যানে হোগা।

কি একটা যেন ঢাকবার জন্য লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করছে! বল্লে—আমার সঙ্গে এসো, মাল দেখাবো।

দু'জনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেকদূর গেল। যে-সময়ের কথা বল্‌ছি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড়-বড় ভড় ও নৌকো ডাঙায় কাদার ওপর পড়ে আছে, দু'-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদাকাঁটার বন, পেছনে অনেকদূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খাঁ-সাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বল্লে—আমায় দেখতে পাচ্ছ তো?

কেন পাবো না? এমন বয়েস এখনও হয়নি যে, এই সন্ধ্যেবেলাতেই চোখে ঠাওর হবে না।

একবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলে—তোমার ডেরা কোথায় খাঁ-সাহেব?

লোকটা চকিতে পিছন ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—কেন, সে তোমার কি দরকার? পুলিশে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভালো হবে না জেনো। মাল দেবো, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে—আমার বাসার খোঁজে তোমার কি কাজ?

লোকটার চোখের চাউনি কি অদ্ভুত! গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করলে। মুখ ভাল দেখা যায় না—কিন্তু ওই দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝল্‌সে উঠল না, সঙ্গে তার টাকা রয়েছে, এ অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যাবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েছে! লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন এসেইছে, তখন আর চারা নেই। বিশেষতঃ সে যে ভয় পেয়েছে, এটা না দেখানোই ভাল। দেখালে, বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না! ছুরি বার ক'রে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেক দূরে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটি গাছের গুঁড়ি পড়ে

আছে গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে, গুদামঘরের আশে-পাশে সর্ব্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হলেও মাঠের মধ্যে ব'লে অন্ধকার তত ঘন নয়—সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হ'ল গুদামঘরটা পুরাণো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে! বাঁশের বেড়া খসে পড়েছে, জায়গায় জায়গায় চালের খোলা উড়ে গিয়েছে, মাঝে মাঝে সামনের দোরটা উই-ধরা,—ভেঙে পড়তে চাইছে যেন!...

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হ'ল! কেন সে এখানে এল এই সন্ধ্যায়? এ-রকম জায়গায় একা মানুষে আসে—বিশেষ ক'রে, এতগুলো টাকা সঙ্গে ক'রে? সে আসত না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙ্গাল দেশ থেকে নতুন আসেনি। কিন্তু ওই লোকটার কথার সুরে কি যাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেছে, সাধ্য ছিল না যে, সে ছাড়ায়! একথা এখন তার মনে হল।...

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁ-সাহেবের মূর্ত্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের, যেন মনে হয়, অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল, আবার ফুটে বেরুল! কোথাও যে চলে গিয়েছিল, এমন মনে হয় না। পাকা ও ঝুনো খেলোয়াড় আর কি!

খাঁ-সাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকল। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে পেছনে আসতে বলল, তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করছে, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। এই অন্ধকার গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও-লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে, কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেছে। লোকটা নিশ্চয়ই জানত যে, তার কাছে টাকা আছে—সন্ধান রেখেছিল। কে জানে, খোদাদাদ খাঁয়ের দলের লোক কিনা? গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে—দৌড়ে পালাবে? কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মত গঙ্গাধর গুদামের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য্য! গুদামের ওদিকের দেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙা! গুদামের সর্ব্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্ব্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু নাকে-মুখে লাগে। একটা কি রকম ভ্যাপ্সা গন্ধ গুদামের মধ্যে! মেঝেটা স্যাঁৎসেতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকেনি!

এদিকে আবার খাঁ-সাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে, যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ...মিনিট দুই হবে...কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা...আবার

সেই ভয়টা হলো। কেমন এক ধরনের ভয়—যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে! এই বা কি রকম ভয়? আর গুদামঘরটার মধ্যে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইছে মাঝে মাঝে!

মিনিট দুই পরেই খাঁ-সাহেব—এই তো আধ-অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে!...

হঠাৎ আবার একটা অদ্ভুত কথা বল্লে খাঁ-সাহেব। বললে—তুমি কালা নাকি? এতক্ষণ কথা বলছি, শুনতে পাচ্ছ না? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোকেন যে জায়গায় আছে বল্লাম—তা দেখতে পেয়েছ? সাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বল্লাম—পিপে দুটো। হাঁ ক'রে সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?

বারে! এ কথা কখন বলেছে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে, মূঢ়ের মত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা? কই, কোথায় সাবল? কথা বল্‌তে বল্‌তে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁ-সাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো, তার বিভ্রান্ত বিমূঢ় আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁ-সাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত, পা, সারা দেহটা যেন চুর চুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়ছে—সব যেন ভেঙে ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে...খাঁ-সাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি ক'রে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধ'রে রাখার জন্যে চেষ্টা করছে, কিন্তু পেরে উঠছে না! তার চোখের সে বিজিত হতাশ দৃষ্টি গঙ্গাধরের হৃদয় স্পর্শ করলে। দেখতে দেখতে অতবড় দীর্ঘাকৃতি দেহের আর কিছু অবশিষ্ট রইল না... সব ভেঙে গেল, গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল...এক...দুই...তিন...চার...

আর কোথায় খাঁ-সাহেব? চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিলিয়ে গিয়েছে... একটা ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসের ঝাপ্‌টা এল কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্ত্তরবে চীৎকার ক'রে গুদামঘরের স্যাঁৎসেতে মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দেশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পেঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায়নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারত না।

...মাস দুই পরে মেটেবুরুজের খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে—গঙ্গাধর, টাকা নিয়ে যাবার দিন কি ঘটেছিল, সেটা বল্‌লে। খোদাদাদ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌লে—সাহজী, ও হলো আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর পনের আগেকার কথা, রমজান

মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল; সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে,—জাহাজের লোকের সঙ্গে সড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখতো, কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে হঠাৎ খুন হয়। কেন বা কে খুন করলে জানা যায়নি, কেউ ধরাও পড়েনি। তবে দলের লোকই তাকে খুন করেছিল, এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্য্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয়, আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রি করবার জন্যে, ওর লুকানো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা ! তা বাবু, সে গুদামঘরটা কোথায়, তুমি দেখাতে পারবে?

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল, তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেত না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়ল, পুরাণো ভাঙা গুদাম-ঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা! হতভাগ্য কি এতদিনেও বোঝেনি, সে মারা গিয়েছে? ...কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন।

—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সদ্য ম্যাট্রিক দিয়েছি। এগ্‌জামিনে essay লিখতে দিয়েছিল, 'দেশ-ভ্রমণের উপকারিতা'। একরাশ কাগজ ভর্ত্তি ক'রে লিখে এসেছি যে, দেশ-ভ্রমণের মত এমন ব্যাপার আর নেই। দেশের কষ্ট, দশের কষ্ট, সব এই এক দেশ-ভ্রমণেই দূর করা যেতে পারে। যে দেশ-ভ্রমণ না করে, সে মানুষ নয়,—আর যে ভ্রমণ ক'রে বেড়ায়, ঘরের ধারে ভুলেও আসে না, তার মত মহাপুরুষ আর ত্রি-জগতে নেই! অর্থাৎ, ঘর-বাড়ী, মা-বাপের স্নেহ-আদর, এসব না হলেও মানুষের বাঁচা আটকায় না—কিন্তু দেশ-ভ্রমণ না করতে পারলে মানুষ বাঁচতে পারে না। দেশ-ভ্রমণের দ্বারা দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট, মহামারী, ম্যালেরিয়া—সব দূর হয়, অতএব সকলে ঘর ছাড়ো, দেশ-ভ্রমণ কর ইত্যাদি। জানি না, এগ্‌জামিনার মশায় কত নম্বর দেবেন আমার সে essay পড়ে—তবে এগ্‌জামিনের পর আমাদের মস্ত দলটি সঙ্কল্প ক'রে ফেললে যে, এবার একবার দেশ-ভ্রমণে বার হওয়া যাক্। কেননা, দেশ-ভ্রমণ না করলে আমরা মানুষ হতে পারবো না।

বাড়ীতে হাঙ্গামা বাধিয়ে অনুমতি আর পয়সা আদায় হলো। তখন সকলে পরামর্শ ক'রে একদিন হাবড়ায় রেলে চড়ে পল্লীগ্রাম-দর্শনে বেরিয়ে পড়া গেল। আগ্রা-দিল্লী যাবার মত অত পয়সা পাব কোথায়? কাজেই মোল্লার দল মস্‌জিদ অবধি দৌড় দেবে ঠিক হলো; অর্থাৎ যাবার জায়গা হলো শেয়াখালা! হাবড়া-শেয়াখালার যে লাইন আছে—মার্টিন কোম্পানীর, সেই রেলে চড়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা যাত্রা করলুম।

নেউগীর মামার-বাড়ী শেয়াখালায়; সে হলো আমাদের গাইড। তার মামারা পশ্চিমে থাকেন, দেশের বাড়ী খালি পড়ে আছে—সেখানে ভারী স্ফূর্ত্তি ক'রে স্বাধীনভাবে থাকা যাবে—সকলের মনে উৎসাহ আর ধরে না! আশু ঘোষ একটা বক্স-হারমোনিয়াম যোগাড় করেছিল—সে মস্ত গাইয়ে! তারপর পালিত চল্‌লো এক ছিপ নিয়ে—শোয়াখালার পুকুরে মাছ সে আর রাখবে না, তার প্রতিজ্ঞা!

ট্রেন ছাড়লো। এর বাড়ীর খিড়কি দিয়ে, ওর বাগান ঘুরে, খানা-ডোবার উপর পুল পার হয়ে, মেটে পথ ধরে, আম-কাঁটালের বনের মাঝ দিয়ে ট্রেন চল্‌লো—কিন্তু ঝাঁকানি যা দিয়ে চল্‌লো, তা চিরকাল মনে থাকবে! আমরা দোলা পেয়ে কে কার ঘাড়ে গড়িয়ে পড়ি! তারি মধ্যে আশু বাজনা নিয়ে মহা-কসরৎ সুরু ক'রে দিলে,—

"ফাগুনে এ দোদুল দোলা দুলিয়ে দে—"

প্রাণ যায় আর কি! একে গরমের ভীষণ তাত্‌—তায় ঐ আওয়াজ! আর একি ফাগুনের দোল! চৈত্রের দোল বটে! ধুলো আর কয়লার গুঁড়ো মেখে তেষ্টায় ছাতি ফাটিয়ে শেয়াখালায় এসে নামলুম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এতক্ষণ অবধি নেউগী প্রচণ্ড উৎসাহে মামার-বাড়ীর নানা গল্প করছিল। ষ্টেশনে এসে দেখি, তার চোখ একেবারে মিন্‌মিন্‌ করছে কাঁচের পুতুলের চোখের মত! আমরা বললুম—কোথায় হে তোমার মামার-বাড়ী?

নেউগী ঢোক গিলে বললে—সে কি ষ্টেশনের পাশেই নাকি! চলো! পথে নেমে নেউগী তাকে-একে প্রশ্ন করে, বাড়ীটা কোন্‌ দিকে। সকলে বললে,—মামার-বাড়ীর পথ জানো না?

নেউগী বললে,—বা রে, সেই কবে এসেছিলুম ছোট মামার বিয়ের সময়! তাও ষ্টেশন থেকে পাল্‌কী ক'রে গিয়েছিলুম, সে কি চিনতে পারি এখন?

তার কথায় আমরা মুষড়ে গেলুম! কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য! মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? আমরা অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরিয়েছি, তরুণের দল—

না জানি ভয়, না জানি মোরা শঙ্কা—
মরুর বুকে হাস্যমুখে বাজিয়ে যাব ডঙ্কা!

হাসি-গল্পে পল্লীর পথ সচকিত ক'রে আমরা চললুম কোন্‌ অজানা কলের মুখে, তা না বুঝেই। দিকে দিকে অন্ধকার নেমে আসছিল—সামনে গাছপালা-গুলো যেন প্রকাণ্ড দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছিল। আমাদের দলের মটকু—তার ছিল ভূতের ভয়; কথাটা আমরা জানতুম। সে শুধু কথা বন্ধ ক'রে মাঝে মাঝে আমাদের হাত চেপে ধরছিল! সহরে থেকে আমরা ভাবতুম, পাড়াগাঁ কি সোনার দেশই না হবে! গাছের ছায়ায় ছায়াকরা সোজা-পথ চলে গেছে গ্রামের বুক ধরে—গাছে-গাছে দোয়েল-শ্যামা নহবৎ বসিয়ে দিয়েছে...পথের পাশে হাঁড়ি-কলসীর দোকান—কোথাও বা খোলা মাঠ—তার একটি সীমায় কাপড়ের

বোনা পাড়ের মত গ্রামের শির ছবির মতই আঁকা—এসে দেখলুম, সেটা কবিদের কল্পনা শুধু! এ যে আঁধার-ভরা এবড়ো-খেবড়ো পথ, ধুলোয় ভরা...কোথায় দোকান, কোথায় বা খোলা মাঠ। পচা ডোবার পাঁকের গন্ধ মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সেই রোদে-পোড়া ঝল্‌সানি হাওয়ায় ভেসে এসে প্রাণটাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে!...

কোনোমতে নিশানদারী ক'রে নেউগীর মামা-বাড়ী এসে পেঁছুনো গেল—বাড়ীর পাশে একটা পুকুর, সামনে মস্ত চাঁপা গাছ। সদরে বড় বড় গুল্‌-বসানো প্রকাণ্ড কপাট—ভেজানো ছিল। ঠেলা দিয়ে ভিতরে ঢুকলুম—একরাশ অন্ধকার অমনি চোখের সামনে জমাট বেঁধে উঠলো। মনে হলো, অন্ধকারের মস্ত সভা বসেছিল এই সদর-কপাটের আড়ালে—সেখানে যত মিশকালো অন্ধকার জমাট বেঁধে কি ষড়্‌যন্ত্র পাকাচ্ছিল—আমাদের দম্‌কা হাসির ঝট্‌কায় সাড়া পেয়ে তারা একবার চম্‌কে স্থির হয়েই তারপর কোথায় যে উবে গেল! একটু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

এ বাড়ীতে এই রাত্রে এসে ভাল কাজ করিনি দেখ্‌ছি! নেউগী মহা অপ্রতিভ! মোমবাতি আর দেশলাই ছিল সঙ্গে, জ্বাললুম। আলো ফুটলে দেখি, সামনে এক মস্ত আটচালা। নেউগী বললে—দাওতো হে একবার বাতিটা; মালী বাড়ীর পাশেই থাকে—বলে সে কারো জবাবের অপেক্ষা না রেখেই বাতি নিয়ে ঝড়ের মত সাঁ করে অন্তর্হিত হলো।

আমরা হতভম্ব! মটকু তো একেবারে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে উঠল,—নেউগী ওর মালী দিয়ে আমায় ষ্টেশনে পেঁছে দিক—আমার এখানে থাকা হবে না। শেষে কি চোর-ডাকাত এসে খুন করে রেখে যাবে!

নরেন বললে,—চোর-ডাকাতে, না ভূতে?

মটকু প্রায় ক্ষেপে উঠে বললে,—না, যাও, সত্যি বলছি, ও-সব চালাকি ভালো লাগে না। কি যে বলো! অজানা জায়গা...ও-সব নিয়ে তামাসা ভালো নয় কিন্তু!

নেউগী ফিরে এল, এসে বললে,—মালী ঘরে নেই। মামাদের যে গোমস্তা আছে, তার বাড়ীতে রক্ষাকালী-পুজো—লোক খাওয়ানো আছে, সেখানে গেছে।

আমরা বললুম,—বেশ! আমাদের প্রাণরক্ষার তাহলে উপায়? খিদে যা পেয়েছে—

নেউগী বললে,—দেখোই না, সব ঠিক আছে। ঐ আটচালার ওধারে ভিতর-বাড়ী; সেখানে রান্নাঘর যা আছে, ইয়া,—আমাদের ইস্কুলের হলের চেয়েও বড়।

আমরা বললুম,—আরে, রান্নাঘর তো আর খাব না। মস্ত ঘর হলো-ত কি হলো তাতে? খাবারের জোগাড় চাই তো।

নেউগী বললে,—এখনি জোগাড় করছি।

কালীর মুখে একটা—'বু-উ-উ-উ' শব্দ করিয়া সমস্ত মশারী ছিঁড়িয়া সর্বাঙ্গে জড়াইয়া

ঘুমে সকলে আচ্ছন্ন, এমন সময়ে এককাণ্ড বাধ্‌লো।

নরেন মটকুকে বললে,—শুনছো, রক্ষাকালী-পুজো! তিথিটা তাহলে কি হলো?

মটকু বললে,—যাও, ও-সব ইয়ার্কি ভালো লাগে না। আমি এখনি চলে যাব। তোমাদের দিন দেখা নেই, কিছু না—এই অমাবস্যায় বেরুনো—

আমরা এমনি হো-হো করে হেসে উঠলুম যে, বেচারীর কথা আর শেষ হলো না।

আমাদের কাছে বাতি ছিল ক'ডজন। তারি চার-পাঁচটা জেবলে ঘুরে দেখি, আটচালার মেঝেয় একখানা ছেঁড়া ধুলো-মাখা জাজিম পাতা আছে। তার শ্রী দেখলে মনে হয়, নেউগীর মামার বহু-প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ যখন নবাব আলীবর্দ্দীর আমলে এখানে বাস করতে আসেন, তখন সেটা রাজমহল থেকে বুঝি সঙ্গে এনেছিলেন! কুছ্ পরোয়া নেই—তাতেই গা ঢেলে সব বসে পড়লুম! আশু বসতে পেয়ে হারমোনিয়মের বাক্স খুলে বাজনা সুরু করে দিলে। মটকুর পানে চেয়ে দেখি, তার মুখ একেবারে শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে!

নেউগী এরি মধ্যে ঘুরে এসে বললে,—গোমস্তা-বাড়ী খপর গেছে, আমরা এসেছি।

নেপেন বললে,—আমাদের সঙ্গে কলা, কেক্ আর পাঁউরুটি আছে তো—এখনকার মত তারি সদ্ব্যবহার করা যাক, এসো!

জল? তাইতো—তেষ্টায় গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে! নেউগী আবার বলেছিল—জল, জল খাবে কি? সেখানে খালি ডাব! যত চাও, খেয়ো। সে-ডাব তো দেখচি, এখন গাছের মাথায়—জলও কোন্ পাঁকভরা পুকুরে!—উপায়? ভাবনায় পেটের ক্ষিধে পেটেই রয়ে গেল।

আমি বললুম,—জল না পেলে ঐ পাঁউরুটি খাওয়া?...আর যে পারে পারুক, আমার তো গলা দিয়ে নামবে না!

নেউগীর আবার অন্তর্দ্ধান! খানিক-পরে সে ফিরলো—দেখি তার সঙ্গে একজন লোক। নেউগী বললে,—উঠে পড় হে, ওঁদের পুজোবাড়ীতে গিয়ে খেতে হবে সব। আমাদের নিয়ে যাবার জন্য লোক এসেছে!

আমরা যেন প্রাণ পেলুম! বলে উঠলুম,—We are ready.

জিনিষপত্রগুলো একটা ঘরে রেখে আমরা ধুলো-পায়েই যাত্রা করলুম। সেখানে মুখ-হাত ধুয়ে আহারাদি শেষ হলো যখন, তখন রিস্ট-ওয়াচে দেখি, বারোটা বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট হয়েছে! এবার ফিরে নিদ্রা দিতে হবে...সারাদিন যা টাল-মাটাল গেছে!

পুজোবাড়ীর চৌকাঠ পেরিয়ে পথে খানিকটা এসে দেখি, আর এগোয় কার সাধ্য? ভীষণ অন্ধকার! যেন জালা-জালা কালি ঢেলে কে আকাশ থেকে পৃথিবীর ফাঁকটুকুকে বুজিয়ে কালো করে দিয়েছে! এগুতে গেলে খানায় পড়ি, কি গাছেই

মাথা ঠুকে মাথা ফাটাই, তার ঠিক নেই! মটকু বলে উঠল,—যে যাবে যাক, আমায় ঐ পুজোবাড়ীর রোয়াকে বলে-কয়ে একটু জায়গা করিয়ে দাও ভাই!

নেউগী বললে—পাগল আর কি! তাও কখনো হয়? তারপর সে বললে,—দাঁড়াও, আমি আলো আনি।

নরেন বললে, দাঁড়াবো কি। এখানে দাঁড়ালে সাপে এমনি ছোবল দেবে। এই তো তাদের বেরুবার সময়। চৈত্র মাসের অন্ধকার রাতেই তাদের মেলা বসে।

মটকু বললে,—রাত্রে নাম করছিস? লতা বলতে হয়! না ভাই নেউগী, আমি আজ এ পুজোবাড়ীতেই থাকবো। বলে-কয়ে আমার শোবার ব্যবস্থা করে দাও। নরেনের সঙ্গে কোন ভদ্রলোক থাকতে পারে না।

নেউগী কি করে! বেচারী আবার সেই পুজোবাড়ীতে গেল, আর আধ-ঘণ্টা পরে প্রকাণ্ড এক মশাল জেবলে নিয়ে এলো—সেই মশালের আলোয় আমরা ডেরায় ফিরে এলুম!

তারপর সেই আটচালায় গড়া-গড়া সব শুয়ে পড়লুম! শুধু নরেন বসে রইল। আমরা বললুম,—শো না রে...

নরেন বললে,—আমায় ভাই একফোঁটা নক্সভমিকা দে, আমার পেটটা ভারী কামড়াচ্ছে।

সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধও ছিল—নরেনের বাতিক। সে বললে,—যদি যাচ্ছি সহরের বাইরে তো দু'চারটে ওষুধ নেওয়া যাক! ফস্ করে যদি কারো পেটের অসুখ হলো, কি জ্বর হলো, কি মাথাই ধরলো, কাজে লাগ্‌বে। তাই সে ক'টা হোমিওপ্যাথির শিশি, কুইনিনের পিল, অ্যাসপিরিণ আর স্মেলিং সল্ট নিয়ে এসেছিল।

শোবামাত্র আমাদের ঘুম এলো। ঘুমের অপরাধ কি? কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, জানি না,—হঠাৎ নরেনের বিষম ঠেলায় ঘুম ভেঙ্গে গেল! মটকু সেই ঠেলায় এমন বিশ্রী চীৎকার করে উঠলো যে, আমার মনে হলো, একটা সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! হয়তো কোথাও থেকে একটা বাঘ এসে কাকেও টেনে নিয়ে গেছে, না হয় তো বাড়ীটায় ডাকাত পড়ে কারও মাথা কেটে নিচ্ছে! ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। ব্যাপার কি?

নরেন বললে,—এই দ্যাখো—বলেই সে জাজিমের একটা কোণ তুলে ধরলে। দেখি, মস্ত একটা গর্ত্ত, খুঁটির মাপে চওড়া।

আমরা বললুম,—এ দেখে কি হবে?

নরেন বললে,—সরে পড় এখান থেকে। বুঝছো না, সাপের গর্ত্ত এটা?

মটকু বললে,—আবার ঐ কথা! না ভাই, নরেন যদি এখানে থাকে, তাহলে আমি কখনই থাকব না। যত বলি, রাত্রে নাম করতে নেই, লতা বলতে হয়, তত খালি-খালি ঐ নাম।

খানিকটা তর্ক তুলে ফল হলো এই যে, সে-রাত্রে আটচালায় শোওয়া হল না, বাড়ীর বাইরে রোয়াকে গিয়ে সব গা গড়িয়ে দিলুম।

পরের দিন ভোর হলে মটকুকে ধরে রাখা গেল না! সে সকলের উপরোধ-মানা তুচ্ছ করে কলকাতায় চলে গেল। আমরা থেকে গেলুম। পাড়াগাঁটা দেখবো না? রাত্রে ঘুম হয়নি—না হোক, সকালের হাওয়াটুকু ভারী মিঠে লাগছিল! নেউগীর মামার পুকুরটি চমৎকার—তার পরিষ্কার জল দেখে নাইবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠলো। পালিত বললে,—পুকুরে মাছ আছে অনেক—ঘাই দিচ্ছে, দেখেছ? ধরতেই হবে!

তাছাড়া, খাবার উপদ্রব ছিল না, পুজোবাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ এসেছিল। খেয়ে সারাদিন টো-টো করে ঘুরে গ্রামখানি দেখা গেল।

আমাদের চোখে সবই বেশ লাগছিল। বড় বড় বাগান, আমের গাছ, কাঁচা আম বেশ বেড়ে উঠেছে...পাখীর ডাক, নিরিবিলি ঘুমন্ত ভাব, ঘোমটা-ঢাকা মেয়েদের কলসী কাঁখে জল আনতে যাওয়া,—লোকজনের ছুটাছুটি নেই, শান্ত কেমন সব—আমাদের মনে ভারী মিঠা সুর বেজে উঠল চারিধারে।

সন্ধ্যার ঠিক আগে পুজোবাড়ীর ভাসান। ঠাকুরের সঙ্গে আর একবার সারা গাঁ ঘুরে বিসর্জ্জন সারা হলো। নেউগী বলে দিলে,—আজ রাত্রে আর খেতে যাব না, যে অন্ধকার পথ! খাবার পাঠিয়ে দেবেন।

তাই হলো। খেয়ে আমরা সে-রাত্রে দোতলার দক্ষিণের দালানে বড় একটা বিছানা পেতে মজলিস বসিয়ে দিলুম। অনেক রাত্রি অবধি গান-বাজনা চল্‌লো; তারপর ঘুমে চোখ ঢুলে এসে গড়া-গড়া শুয়ে পড়লুম।

ঘুমে সকলে আচ্ছন্ন, এমন সময়ে এক কাণ্ড বাধ্‌লো। নরেন ঠেলা দিয়ে ডাকলে,—ওরে ন্যাড়া, শীগ্‌গির ওঠ্‌।

আমি ধড়মড়িয়ে উঠেই জিজ্ঞাসা করলুম,—কি, সাপ বেরিয়েছে নাকি?

নরেন কাঁচুমাচুভাবে বললে,—না।

দালানের দু'কোণে দুটো বাতি জ্বলছিল—তারি আলোয় দেখি, তার মুখের রঙ্‌ একদম সাদা ফ্যাকাশে!

আমি বললুম, সাপ নয়, তবে কি?

খুব চাপা গলায় ভয়ে ভয়ে নরেন বললে,—ঐ শোনো—

কাণ পেতে শুনলুম,—পাশের তালাবন্ধ ঘরে ছোট ছেলের গোঙানির মত একটা শব্দ, তারপর সব চুপচাপ! তারপরই ভয়ানক একটা দাপাদাপি—যেন খুব মারামারি চলেছে! আর দোর-জানলায় কে লাঠি ঠুকছে!

গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগলো। দলের সকলকে ব্যাপারখানা বলা হলো। অত-বড় সাহসী যে নেউগী, সে তো একেবারে আমাদের দু'-তিনজনকে জড়িয়ে ধরলে!

সকলে চুপ—কারো মুখে কথা নেই! —আর আমার বুকের মধ্যে? ওঃ, সে যেন দুম্ দুম্ মুগুরের ঘা পড়ছে—এমনি প্রচণ্ড শব্দ!

মনে হচ্ছিল, প্রাণটা বুঝি এখনি থেঁতো চুরমার হয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসবে!

আশু বললে,—দেখো, ওদের বাড়ীতে একটা লোক বলছিল, রাত্রে আপনারা ও-বাড়ীতে থাকবেন না, ও-বাড়ীতে ভয় আছে। শুনে আমি তখন হেসেছিলুম। এখন দেখ্‌ছি, তার কথা শোনা উচিত ছিল।

পালিত বললে,—আমাদের তখন বল্‌লি না কেন?

কিন্তু তখন আর বলে ফল কি? খুব ঝট্‌পট্ আওয়াজের পর বাড়ীটা স্তব্ধ গুম্ হয়ে থাকে—আর বাইরে বাতাসের সোঁ-সোঁ গর্জ্জন! আকাশে মিট্‌মিটে তারা—মনে হচ্ছিল, ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটে যাবে, তাই গাছপালা অধীর হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলছে!

অবস্থা শেষে এমন হলো যে, সকলে সে-বাড়ী ছেড়ে বেরুবো, তার উপায় রইল না। মনে হলো, আমরা বেরিয়ে পড়লে ওরাও দলসুদ্ধ ছুটে এসে পাছু নেবে? তখন? কি যে হবে তখন, কে জানে! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কোন-মতে জেগে সাহস করে বসে থাকাই যাক! একেবারে উদ্যত হয়ে, যদি ওরা বেরিয়ে এসে আক্রমণ করে তো একবার লড়তে হবে—শেষ চেষ্টা!

এমনি করেই এক জায়গায় গুড়ি মেরে বসে সারা রাত্রিটা যে কেমন করে কাটলো, সে কথা আর বলে কাজ নেই। আমাদের সে দুর্দ্দশা আর তখনকার মুখ-চোখের ভাব দেখলে অতি বড় পাষাণ-শত্রুর চোখেও জল আসতো!

ভোর হলে আস্তে আস্তে সব বেরিয়ে এলুম—ভারী সন্তর্পণে, ভারী হুঁশিয়ার হয়ে—পেছনে কেউ তাড়া না করে। জিনিসপত্র সেই দালানেই পড়ে রইল। আশু তার বাজনাটা নিতে যাচ্ছিল। তাকে একচড় লাগিয়ে আমি বললুম—আগে প্রাণ বাঁচুক, তারপর বাজনার খোঁজ করিস! নেউগীর উপর রাগ হচ্ছিল যা, ওঃ! এমন হতভাগার সঙ্গেও দেশ-ভ্রমণে বেরোয়! যদি বন্ধু না হতো, তা হলে তার মাথাটাই এক চড়ে উড়িয়ে দিতুম।

নীচের রোয়াকে মালীটা ঘুমোচ্ছিল—তাকে দিলুম এক ঠ্যালা। ঠ্যালা খেয়ে সে জেগে উঠল। তারপর বাইরে পথে কতক্ষণে সবাই পায়চারি করে, খানিক সুস্থ হয়ে মালীকে নিয়ে উপরে এলুম—তাকে ঘর খুলতে বললুম।

মালী যখন ঘরের তালা খুলছিল, আমরা তার পিছন থেকে ঘরটার মধ্যে উঁকি মেরে দেখছিলুম,—মড়ার মাথার খুলি, কি কঙ্কাল, কি কারো রক্তটক্ত ঘরে পড়ে আছে কি না!

কিছু নাঃ মালী ঘরে ঢুকলো, ঢুকেই জানলা খুলে দিলে—সকালকার রৌদ্র অমনি ঘরের মধ্যে লুটিয়ে পড়লো,—ঘর আলোয় আলো হলো!

ঘরের মধ্যে আমরা ভয়ে ভয়ে পা বাড়িয়ে ঢুকলুম। তারপর যা কাণ্ড দেখলুম —ওঃ, হেসে আর বাঁচি না! ঘরের কার্নিশে একরাশ চামচিকে আলো পেয়ে তাল পাকিয়ে ছিল, ঠিক যেন একরাশ কালো ঝুলের পুঁটলী!

দিলুম তাড়া।—ঝট্‌পট্‌ করে তারা ঐ কার্নিশের ফোকরেই ফের লেপটে রইল, ঠিক যেন শিক-ভাঙ্গা ছাতার কাপড় খানিকটা।

নরেনকে বললুম,—দেখ দিকি, ঐ চামচিকের ভয়ে কাল ঘুমুতে দিস্‌নি!

নরেন বললে,—কেন, মশায়রা তখন দেখতে পারেন নি? ভয় শুধু আমারি হয়েছিল,—বটে?

ঠিক দালানের দিকের জানলাটা আমরা দালানে ঢুকেই বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়েছিলুম—কাজেই বেচারীরা বেরুতে না পেরে ডানা ঝট্‌পট্‌ করে মরেছে সারারাত, আর আমাদের ভয় দেখিয়েছে।

যাই হোক্‌,—দু'রাত্রির ব্যাপারে চোখ সকলের জ্বলে লাল হয়ে উঠেছিল। আশুর জ্বরের মত হয়েছিল, নরেনের আমাশা দাঁড়ালো। তখন পল্লীর আনন্দ পল্লীর বুকেই গচ্ছিত রেখে আমরা না খেয়েই বেরিয়ে পড়লুম ষ্টেশনের দিকে। তারপর যে ট্রেনটা পাওয়া গেল, তাতে চড়েই একেবারে কলকাতায়।

ওরে আমাদের গাড়ী-ঘোড়া, লোক-জনের ভিড়ে-ভরা সহর কলকাতা। ওরে আমাদের গ্যাসের-আলোয় আলো-করা, গাছ-পাতার চিহ্ন-ছাড়া কলকাতার পথ-ঘাট, বেঁচে থাকো, আমাদের ভয়-ভাঙ্গা সহর! পাড়াগাঁ যেখানে আছে, সেইখানেই থাকুক, ওধারে আর যাচ্ছি না অন্ততঃ সন্ধ্যার পর!

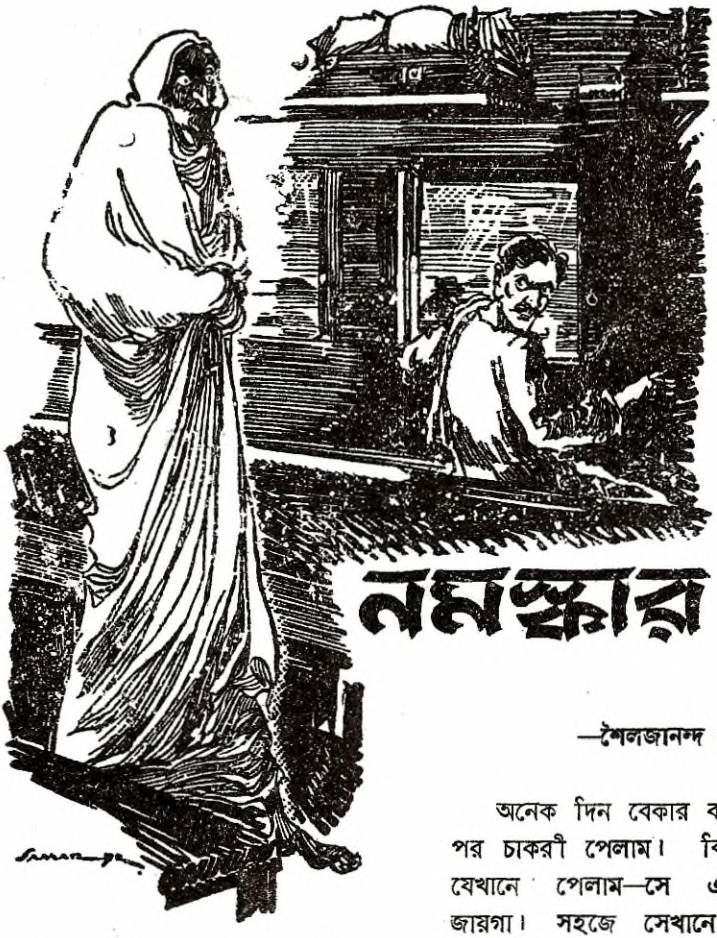

নমস্কার

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অনেক দিন বেকার বসে থাকবার পর চাকরী পেলাম। কিন্তু চাকরী যেখানে পেলাম—সে এক ভীষণ জায়গা। সহজে সেখানে বড়-একটা কেউ যায় না। আমার আগে যাঁরা গেছেন, সকলেই মরেছেন এবং সে এক আশ্চর্য্য মৃত্যু! রোগ নেই, ব্যাধি নেই, সারাদিন কাজকর্ম্ম ক'রে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়েছেন, সকালে দেখা গেল, তিনি আর উঠছেন না, বিছানাতেই মরে পড়ে আছেন! মুখের চেহারা হয়ে গেছে— কিম্ভূতকিমাকার বিশ্রী! মনে হয়, যেন মরবার সময় তিনি ভয় পেয়েছিলেন! কিন্তু কেন ভয় পেয়েছিলেন, কিসের ভয়—সে সব তখন কে আর বলবে?

আমার কিন্তু ভয় বলে কোন বস্তু ছেলেবেলা থেকেই নেই, তাই একটুখানি

ভরসা হলো। ভাবলাম—চোর-ডাকাত যদি খুন করে দিয়ে যায়, সে এক কথা আলাদা, তাছাড়া আর-কিছুর ভয় আমি করি না।

যাই হোক্, মরি মরব; অর্থাভাবে দিনে দিনে তিলে তিলে মরার চেয়ে সে বরং ঢের ভালো।

চাকরী নিলাম। জায়গাটা বেশি দূরে নয়। বাংলা দেশের মধ্যেই। বড় একটা ষ্টেশনে গাড়ী বদল করে ছোট একটি ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেণে চড়লাম। কথা ছিল লাইন যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেইখানেই আমার কাজের জায়গা। সন্ধ্যার একটু পরেই আকাশে চাঁদ উঠেছে! শরৎকালের নীল নির্ম্মল আকাশ। শুভ্র সুন্দর জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত ছোট ছোট গ্রাম, সবুজ ধানের মাঠ আর গাছপালার মাঝখান দিয়ে ছোট লাইনের ছোট্ট ট্রেণখানি আমাদের এগিয়ে চলেছে। দূরে দূরে একটি করে ষ্টেশন। টিম্-টিম্ করে দু'একটি কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। দু'একজন লোক নামছে, দু'একজন উঠছে; লোকজনের কোলাহল নেই, গোলমাল নেই, দু'-একটি ছোট-খাটো কথা, ইঞ্জিনের সাঁই সাঁই শব্দ আর গার্ড-সাহেবের হুইশ্‌ল্।

জানালায় হাত রেখে বাইরের পানে তাকিয়ে ছিলাম। ট্রেণের যাত্রী নিয়ে গ্রামের পথে কোথাও-বা একটি গরুর গাড়ী চলেছে, কোথাও-বা আঁকা-বাঁকা ছোট একটি শুক্‌নো নদীর সাদা বালি চাঁদের আলোয় চিক্ চিক্ করছে! দূরের অস্পষ্ট গ্রাম ধোঁয়ার মত কুয়াশায় ঢেকে গেছে, লাইনের ধারে ধারে শুভ্র সুন্দর কাশের গুচ্ছ বাতাসে দুলছে, মাঝে-মাঝে দূরের গ্রাম থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি।

গাড়ী আমাদের কখনও দাঁড়াচ্ছে, কখনও চলছে।

মাঝে কোন্ সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্‌লো, চেয়ে দেখি,—আমার কামরা একেবারে ফাঁকা। যাঁরা ছিলেন, কখন যে তাঁরা নেমে গেছেন, কিছু বুঝতেই পারি নি। পেছনে পায়ের শব্দ হ'তেই ফিরে দেখলাম—আপাদমস্তক সাদা চাদরমুড়ি দিয়ে কালোমত প্রকাণ্ড লম্বা এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কেন আসছেন বুঝলাম না। সে রকম লম্বা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। কাছে আসতেই আমি তাঁর মুখের পানে তাকালাম। কালো কিম্ভূত-কিমাকার সে এক অদ্ভুত মুখ। মানুষের মুখ বলে মনে হয় না। ঠিক যেন ছাগলের মত। এক-একটা পাঁঠার যেমন দাড়ি থাকে তেমনি দাড়ি; গোঁফগুলি একটি একটি করে গোনা যায়! আর সেই কালো মুখের ওপর অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল গোল-গোল সাদা দুটো চোখ!

চোখে আমার ঘুমের ঘোর যদি-বা একটুখানি ছিল, লোকটাকে আমার সুমুখের বেঞ্চে বসতে দেখে সেটুকুও উড়ে গেল!

কারও মুখে কোনও কথা নেই! শেষে তিনিই আমায় দয়া করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাওয়া হবে?'

গলার আওয়াজও তেমনি! মনে হলো, যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরোচ্ছে।

বললাম, 'শালবুনি।'

তিনি বললেন, 'চলুন, আমিও যাব!'

বাধিত হলাম।

চাকরির জায়গায় পেঁছাতে না পেঁছাতেই এই!

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি শালবুনিতেই থাকেন?'

ঘাড় নেড়ে জানালেন, 'না!'

কোথায় থাকা হয়, সেকথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হলো না। বললাম, 'সিম্‌সান্‌ কোম্পানীর যে লোহার কারখানাটা তৈরী হচ্ছে, ষ্টেশন থেকে সেটা কত দূরে মশাই?'

'কাছেই।'

শুনে আশ্বস্ত হলাম।

বললাম, 'আচ্ছা বলতে পারেন মশাই, শুনছি নাকি তিন-চারজন লোক সেখানে মারা গেছে? কেন মারা গেছে, জানেন আপনি?'

তিনি তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছেন। কোনও জবাব পেলাম না। সর্ব্বনাশ! তবে কি এইখান থেকেই সঙ্গ নিলেন নাকি? শালবুনি ষ্টেশন আর কত দূরে সেই কথাই ভাবতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে ট্রেণের গতি মন্থর হয়ে এলো।

ভদ্রলোক এতক্ষণ পরে আমার দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, 'কারখানায় চাকরী নিয়ে এলেন বুঝি?'

বললাম, 'কি আর করি মশাই, পেটের দায়ে.....দু'তিনটি ছেলেমেয়ে—

তিনি বললেন, 'যদি মারা যান?'

সেকথা নিজেও কতবার ভেবেছি, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ এই কথাটা শোনবা-মাত্র বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধ্বক্‌ করে উঠলো। বললাম, 'তাহ'লে না খেতে পেয়ে সবাই মারা যাবে।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেমেয়ে ক'টি?'

বললাম, 'তিনটি। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে।'

'সংসারে আর কে আছে?'

'বুড়ো বাবা, মা, পিসী, মাসী, ভাগ্‌নে, ভাগ্‌নী—পোষ্যের আর অন্ত নেই মশাই!'

'হুঁ' বলে তিনি একবার বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে কি যেন দেখলেন! দেখেই

বললেন, 'বুড়ো মা-বাপকে খেতে দেওয়া ভালো! আজকাল অনেকে দেয় না। আমিও বুড়ো হয়েছিলাম মশাই, কিন্তু এম্‌নি পাজি ছেলে—'

বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ষ্টেশন এসে গেছে।'

গাড়ী কিন্তু তখনও থামে নি। তাঁর জীবনের গল্পটা শোনবার কৌতূহল হ'লো। বললাম, 'বসুন না! গাড়ী ত আর এগোবে না।'

এই বলে পকেট থেকে একটা বিড়ি আর দেশলাইটা বের করে বললাম, 'খান।'

ভাবলাম, তাতেও যদি বসে তাঁর জীবনের গল্পটা বলেন! কিন্তু বিড়ি-দেশলাই তিনি হাত বাড়িয়ে নিলেন মাত্র, দেশলাইও জ্বাললেন না, বিড়িও খেলেন না; গাড়ী আমাদের ষ্টেশনে পেঁছে গেল এবং পেঁছোবামাত্র দরজা খুলে তিনি নেমে পড়লেন। যাবার সময় একটা নমস্কার করে বিদায় নেওয়া দূরে থাক্, আমার দেশলাইটাও ফিরিয়ে দেবার সময় তাঁর আর হ'ল না!

তৎক্ষণাৎ আমি তাঁর পিছু পিছু দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলাম। তিনি ঠিক কোন্ দিকে যান দেখবার উদ্দেশ্যও যে ছিল না, তা নয়; অবশ্য আমার অন্য প্রয়োজনও ছিল। আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে কারখানা থেকে লোক আসবার কথা।

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড! দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি—গাড়ী তখনও ঠিক প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে এসে পেঁছোয়নি, তখনও গাড়ীখানা ধীরে ধীরে চলছে।

লোকটি কি তবে টিকিট করে নি? তাই টিকিট দেবার ভয়ে তাড়াতাড়ি নেবে গেল? কিন্তু অত বড় লম্বা চেহারা সহজে ত' চোখের আড়াল হবার যো নেই! জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক্ ঠিক দিনের মত স্পষ্ট পরিষ্কার, অথচ এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে কোনদিকেই তাঁকে দেখতে পেলাম না! মানুষ বলে মনে-মনে যদিই-বা একটুখানি সন্দেহ হয়েছিল, সেটুকুও এবার ঘুচে গেল। মানুষ কখনও এত সহজে চোখের সুমুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না।

বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল! একে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন জায়গা, তায় আবার পেঁছোতে না পেঁছোতেই এই অভিজ্ঞতা! পেটের দায়ে চাকরী করতে এসে কি যে অদৃষ্টে আছে কে জানে?

কারখানা থেকে দু'জন গুর্খা চাপরাশী এসেছে, আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। গাড়ী থেকে আমার জিনিসপত্র তারাই নামালো।

প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু শালের জঙ্গল। ছোট ছোট কয়েকটি পাহাড়ও দেখলাম।

ট্রেণের লাইন এইখানে এসেই শেষ হয়েছে। গাড়ীতে ওঠবার সময় লক্ষ্য করি নি, এখন দেখলাম—ট্রেণখানার দু'দিকে দুটো ইঞ্জিন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একটা সুমুখে, একটা পিছনে। এইবার পিছনের ইঞ্জিনটা পিছু হটতে সুরু করলে। গাড়ীটা যেদিক থেকে এসেছিল, হুস হুস ক'রে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার সেইদিকেই চলে গেল।

চারিদিক্ নির্জ্জন! মাঝখানে ইস্পাতের ঝক্‌ঝকে লাইন চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে, এপাশে ছোট্ট একটি ষ্টেশন, আর ওপাশে আমাদের কারখানা। কারখানা হ'তে তখনও অনেক দেরি। প্রকাণ্ড বড় বড় লোহার যন্ত্রপাতি এসে পেঁছেছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে নানান রকমের লোহালক্কড় ইতস্ততঃ ছড়ানো, আর তারই একপাশে আমাদের থাকবার জন্যে টিনের ছোট ছোট কয়েকটি অস্থায়ী ঘর তৈরি হয়েছে।

শুনলাম নাকি ওই টিনের ঘরেই আমার আগে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের জীবন-লীলার অবসান হয়ে গেছে। তবু সে-রাত্রির মত আমাকে সেইখানেই থাকতে হলো।

বাঙ্গালী ছোক্‌রাটি জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমার জন্যে সে রান্না ক'রে রেখেছিল। ঠিক হলো— নিজের হাতে রান্না আমায় কোনদিনই করতে হবে না, সে-ই রোজ আমার রান্না ক'রে দেবে। সেদিন রাত্রে তাকে আর আমার কাছ ছেড়ে যেতে দিলাম না। খাওয়া-দাওয়ার পর সে আমারই কাছে ছোট্ট একটি বিছানা বিছিয়ে শুয়ে রইলো। কাছাকাছি কোন্ একটা গ্রামে তার বাড়ী। নাম—যতীন।

প্রথমেই সে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি ব্রাহ্মণ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

যতীন বললে, 'ব্যস্, তা'হলে আর আপনার ভয় নেই।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি, বল দেখি যতীন?'

যতীন বললে, 'যারা মরেছে, তাদের ভূতে মেরেছে কিনা! গেছো ভূতে। ভূত কখনও বামুনকে মারে না! ওরা বামুন কেউ ছিল না।' বললাম 'বামুনকে মারবে না, তা তুমি কেমন ক'রে জানলে যতীন?' যতীন একটুখানি হাসল। হেসে বললে, পৈতে ছুঁয়ে একবার যদি গায়ত্রী জপ ক'রে দেন ত' ভূতের বাবার সাধ্য নেই যে, আপনার কাছে এগোয়! তা নইলে ওদের তিন-তিনটেকে মেরে ফেললে, আর আমাকে মারতে পারতো না?'

ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক। কিছুই বুঝবার উপায় নেই। রাত্রে ভাল ঘুমও হলো না। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ ক'রে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখন সবে সূর্য্যোদয় হচ্ছে। পূর্ব্বদিকে সবুজ বনের মাথার উপর আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া বইছে। জায়গাটি বড় চমৎকার!

আমায় বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখেই গুর্খা চাপরাশী দু'জন সেলাম ক'রে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে, কাজ আরম্ভ হবে কি না এবং তা যদি হয়, তাহ'লে ওরা আশ-পাশের গ্রাম থেকে লোক ডাকতে যাবে।

বললাম, 'যাও, তোমরা লোক নিয়ে এসো। কাজ আরম্ভ হবে।'

এখন আমাদের কাজ শুধু জঙ্গলের গাছ কাটা। কোম্পানী তার জন্যে আমার সঙ্গে দিয়েছে একশ'টাকা। তাছাড়া, টাকার দরকার হ'লেই হয় হেড্-আপিসে জানাতে হবে, আর না হয় এখানকার জংশন-ষ্টেশনে কোম্পানীর যে চূণের কারখানা

আছে, সেখানে জানালেই তারা তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়ে দেবে। আমার ওপর হুকুম—এক মাসের মধ্যে অন্ততঃ হাজার বিঘে জমি সাফ ক'রে ফেলা চাই।

চাপ্‌রাশীদের বলে দিলাম, 'লোক তোমরা যত বেশি পারো নিয়ে এসো।'

তারা লোক আনতে চলে গেল।

ভাবলাম, আমার একমাত্র প্রতিবেশী ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়টা ক'রে আসি। কিন্তু এত সকালে ভদ্রলোক ঘুম থেকে উঠেছেন কি না, কে জানে? একটু পরেই যাওয়া যাবে ভেবে, পায়ে-চলা যে সরু পথটি জঙ্গলের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে, সেই পথ ধরে হাঁটতে সুরু করলাম। দু'পাশে শাল আর মহুয়ার ছোট-বড় নানা রকমের গাছ সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখি, শাখায়-প্রশাখায়, চিকণ কচি লতায়-পল্লবে ক্রমশঃ তারা এমনিভাবে ঘন সন্নিবদ্ধ যে, বেশীদূর দৃষ্টি চলে না। যেদিকে তাকাই—শুধু গাছ আর পাতা, পাতা আর গাছ। মৃদুমন্দ বাতাসে পাতাগুলি ঝির্ ঝির্ ক'রে কাঁপছে, নানারকমের অসংখ্য পাখী উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় হয়ত কোন্ বুনো গাছে বুনো ফুল ফুটেছে; তারই মিষ্টি সুগন্ধে বাতাস যেন ভরে আছে। চিত্র-বিচিত্রিত চমৎকার একটি প্রজাপতি উড়তে উড়তে হঠাৎ আমার গায়ে এসে বসলো। ইচ্ছে করলেই তাকে আমি ধরতে পারতাম, কিন্তু ধরলাম না। হাতটি আমার চোখের কাছে এনে যেই তাকে আমি ভাল ক'রে দেখতে গেলাম, রঙিন পাখা উড়িয়ে তৎক্ষণাৎ সে আমার হাতের ওপর থেকে উড়ে পালালো। ছায়াশীতল স্নিগ্ধ সেই অরণ্যের মাঝখান দিয়ে মনের আনন্দে অন্যমনস্ক হয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিলাম, পেছনে হঠাৎ একটা ট্রেণের শব্দে যেন আমার চৈতন্য হলো! এবার ফিরতে হবে। ফেরার পথে যতই আমি সেই সতেজ সবুজ গাছগুলির পানে তাকাই, ততই আমার মনে হ'তে থাকে,—আমি যেন ওদের পরম শত্রু! কতকাল ধরে এরা এইখানে এই ধরিত্রী-মাতার বুকের ওপর সযত্নপালিত সন্তানের মত ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে, বিশ্বের বিস্ময় প্রাণবন্ত এই সব বিশাল মহীরুহ,—আমি এসেছি তাদের সমূলে উৎপাটিত ক'রে সবংশে নিধন করে দিতে! নিবিড় ঘন অরণ্যানীর নয়ন-মনোহর এই স্নিগ্ধ শ্যাম রূপ আমায় নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দিতে হবে, তার পরিবর্ত্তে বসবে এখানে—এক বিরাট কারখানা! —লোহা আর ইস্পাত, ইঞ্জিন আর আগুন!...আমার আগে যাঁরা এলেন, নিজের জীবন দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেলেন কি না, তাই বা কে জানে!

ট্রেণ এসেছে, আবার চলেও গেছে। ষ্টেশন-মাষ্টার বসে বসে একটা মোটা খাতায় কি যেন লিখছিলেন! মোটা-সোটা, বেঁটে-খাটো মানুষটি। পরিচয় হতেই মুখখানি তাঁর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খাতা বন্ধ করে তিনি গল্প জুড়ে দিলেন।

বললাম, 'কাজ করুন।'

তিনি বললেন, 'ধ্যুৎ তেরি কাজ! মানুষের মুখ দেখতে পাই না মশাই, দুটো কথা ব'লে যে সুখ হবে, তা এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে তারও উপায় নেই! দিন না-মশাই চট্‌পট্‌ ওই গাছগুলোকে কেটে উড়িয়ে! তবু একটা কারখানা-টারখানা হবে, সহর বসবে, বাজার বসবে, লোকজন তবু দেখতে পাব।'

বললাম, 'কিন্তু ওই গাছ কাটতে গিয়েই শুনছি, আমার আগে তিন-তিনজন—'

কথাটাকে তিনি আর শেষ করতে দিলেন না। টেবিল চাপ্‌ড়ে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, 'আরে দূর দূর! আমি ও-সব বিশ্বাস করি না মশাই, ভূত না আরও কিছু! ভূত না হয় মেরেই দিয়ে গেল, কিন্তু টাকাকড়িগুলো গেল কোথায়? সেগুলোও কি ভূতে নিয়ে গেল নাকি?'

কথাটা ভাল বুঝতে পারলাম না, তাই তাঁকে আর একবার ভাল ক'রে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, তাঁর বিশ্বাস, ভূতে তাদের মারেনি, মেরেছে মানুষে। কুলি-বিদেয় করবার টাকাকড়ি তাদের কাছেই থাকতো, সেই টাকার লোভে কেউ তাদের মেরে ফেলেছে!'

তিনি বললেন, 'আমার কিন্তু মশাই, ও গুর্খা চাপ্‌রাশী দুটোকে বিশ্বাস হয় না। বললে কথা শোনে না, ব্যাটারা যেন নবাব-পুত্তুর!'

বললাম, 'কি জানি মশাই, কি করব, তাই ভাবছি।'

মাষ্টারমশাই-এর টেলিগ্রাফ এসেছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। টেলিগ্রাফের কলটার কাছে গিয়ে টক্‌ টক্‌ ক'রে কলটা বারকতক বাজিয়ে দিয়ে বললেন, 'বলছি দাঁড়ান! আপনার আগে যে লোকটা এসেছিল, তাকেও বলেছিলাম; কিন্তু সে হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালীর কথা শুনলে না, ভাবলে—বুঝি আমি ওর টাকাগুলো বাগাবার মতলবে আছি।'

কাজ শেষ ক'রে তিনি আবার আমার কাছে এসে বসলেন। বললেন, 'টাকাকড়ি নিজের কাছে রাখবেন না দাদা, আমি ভাল কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, শুনুন।'

ব'লে তিনি ষ্টেশন-ঘরের দেওয়ালের গায়ে-লাগানো একটা আয়রণ্‌ সেফ্‌ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওইখানে রাখতে পারেন। পরের টাকা ওখানে রাখতে অবশ্য আমি দিতাম না, কিন্তু আপনি একে বাঙ্গালী, তায় ব্রাহ্মণ; তাই বল্‌ছি, একবার রেখে দেখুন দেখি—কি হয়। রাত দশটায় আমার শেষ ট্রেনখানা পার ক'রে দিয়ে আমি আমার বাসায় চলে যাই, সেই সময় চাবি আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলে যাব। আপনি ইচ্ছে করলে রাত্রে এখানে শুয়েও থাকতে পারেন। বেশ ক'রে দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে এই টেবিলের ওপর তোফা আরাম ক'রে নাক ডাকবেন মশাই! টাকা থাকবে ওই আয়রণ চেষ্টের মধ্যে, দেখুন ত', দেখি ভূতে কেমন ক'রে মারে?'

পরামর্শ মন্দ নয়।

খাবার জোগাড় করবার জন্যে যতীন আমার কাছে টাকা চাইতে এলে, টাকা দিয়ে বললাম, 'রাত্রে আমি এইখানে থাকব যতীন।'

যতীন হেসে বললে, 'বুঝতে পেরেছি, বাবু ভয় পেয়েছেন। তা আপনার ভয় কি বাবু, আপনি বেরাহ্মণ মানুষ—আমি ত' তখন আপনাকে বলেই দিলাম!'

গুর্খা চাপ্‌রাশী দুজন বেশ কাজের লোক। গাছ কাটবার জন্যে প্রায় পঞ্চাশজন কুলি তারা ধরে নিয়ে এলো। একশ' টাকা আর কতক্ষণ! দিনের শেষে কুলিদের মজুরি দিতে গিয়ে দেখি—অনেকখানি জায়গা তারা পরিষ্কার ক'রে ফেলেছে।

রামলাল গুর্খা বললে, 'বাবু, হেট্‌-আপিস্‌সে বহুট্‌ রুপেয়া মাঙ্গায় লেন।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাজ কি তাহ'লে এতদিন হয়নি রামলাল?'

রামলাল বললে, 'ঠোড়া ঠোড়া হয়েছে বাবু!'

শিউশরণ ব'লে রামলালের সঙ্গীটি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, 'উ বাবুলোক বহুট্‌ রুপেয়া চুরি করিয়েসে বাবু!'

তা হয়ত হবে। কিন্তু সে-টা তাদের কাজে লাগেনি। টাকা ত' যমের বাড়ী পর্য্যন্ত পেঁছোয় না!

যাই হোক—সেইদিনই হেড-আপিসে 'তার' ক'রে দিলাম—একসঙ্গে মোটা রকমের কিছু টাকা আমায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক্‌, নইলে কাজের ভারি অসুবিধা হবে।

কিন্তু টাকা আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল। আমার আগে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও হয়ত' এমনি ক'রে টাকা নিয়েছেন, কিন্তু কাজ বেশিদূর এগোয়নি; অথচ টাকার হিসেব না দিয়েই তাঁরা মরে গেছেন। এমনি ক'রে কোম্পানীর অনেক টাকা ক্ষতি হয়েছে। তাই টাকা না এসে কলকাতার হেড্‌-আপিস থেকে এলেন একজন ইন্‌স্‌পেক্টর।

কাজ দেখে তিনি খুশী হলেন। অসংখ্য গাছ তখন আমি কাটিয়ে স্তূপাকার ক'রে ফেলেছি। বনের শ্যামল শ্রী একেবারে নির্ম্মমভাবে নষ্ট ক'রে দিয়ে অনেকখানি জায়গা তখন ফাঁকা ক'রে দিয়েছি। কিন্তু কুলিরা বেতন পায়নি প্রায় সপ্তাহখানেকের, তারা আমায় তখন ছিঁড়ে খাচ্ছে। বললাম, 'টাকা আপনি গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন, নইলে কাজ হয়ত আমার বন্ধ ক'রে দিতে হবে।'

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, 'টাকা আপনার পরশু পেঁছে যাবে। এখন এক হাজার টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি, ফুরিয়ে যাবার আগেই জানাবেন।'

তাঁকে আমি ট্রেণে চড়িয়ে দিয়ে এলাম। শিউশরণ আমার সঙ্গে গিয়েছিল। ফেরবার পথে শিউশরণ বললে, 'আরও বেশী টাকা মাঙ্গায় লেন বাবু, এক হাজার টাকা আর কোতোদিন যাবে।'

বললাম, 'ফুরোলেই আবার পাঠাবে।'

যতীনকে প্রায়ই বলতাম, 'কই যতীন, মরলাম না ত'? বড় বড় গাছগুলোকে ত'-প্রায় সবই কেটে ফেললাম।'

যতীন হেসে জবাব দিত, 'আমি ত' বাবু আগেই সে কথা ব'লে দিয়েছি। বামুনের কোনও ভয় নেই।'

বলতাম, 'ঠিক বলেছ। কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করিনি, এখন দেখছি, সেই কথাই সত্যি।'

যতীন বলতো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ও-সব অনেক জানা আছে।'

রাত্রে সেদিন খেতে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভূত তুমি নিজে কোনোদিন দেখেছ যতীন?'

যতীন বললে, 'তা, আজ্ঞে, দেখেছি বই কি!'

এই ব'লে সে তার ভূত-দেখার গল্প আরম্ভ করলে। এমন গল্প যে, সে আর সহজে থামতে চায় না। এদিকে রাত্রির শেষ-গাড়ীটা তখন ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ীটা ছেড়ে গেলেই ষ্টেশন-মাষ্টার বাসায় চলে যাবেন। তার আগেই আমার সেখানে যাওয়া দরকার। কারণ, রাত্রে আমার শোবার বন্দোবস্ত সেইখানেই। কাজেই বাধ্য হয়ে যতীনকে বললাম, 'বাকিটা কাল শুনব যতীন, আজ থাক্।'

কিন্তু এমনি তার গল্প বলবার সখ যে, সে শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত গল্পটা তার বলতে বলতে এলো!

গাড়ী চলে গেছে, মাষ্টারমশাই তখন বসে আছেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'বসে আছেন যে এখনও?'

বললেন, 'আসুন, আপনারই জন্য বসে আছি।'

বললাম, 'এবার আপনি যেতে পারেন!'

তিনি বললেন, 'যাব কি মশাই, জংশন থেকে তার এলো, আপনার একহাজার টাকা নিয়ে লোক আসছে।'

'কেমন ক'রে আসবে? গাড়ীত' চলে গেল!'

তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, 'একি আর আপনার-আমার কাজ মশাই, অত বড় সায়েব-কোম্পানীর কাজ,—খাতির কত! জংশন থেকে একখানা পাইলট্ ইঞ্জিন দিয়েছে, তাইতেই লোক আপনার এলো ব'লে!'

যতীন বললে, 'তাহলে এই অবসরে গল্পটা আমার শেষ করে নিই বাবু, শুনুন।'

ব'লে সে তার গল্প শেষ করতে বসলো।

গল্প শেষ হতে না হ'তেই হুস্ হুস্ ক'রে ইঞ্জিন এসে দাঁড়ালো! ইঞ্জিন থেকে নামলো এক সাহেব। একহাজার টাকা—অন্য কারও হাতে পাঠাতে হয়ত' বিশ্বাস হয়নি, তাই চুণের কারখানার ছোট সাহেব নিজে এসেছেন।

টাকা দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নিয়ে, তিনি আবার সেই ইঞ্জিনেই ফিরে গেলেন।

টাকাগুলো লোহার সিন্দুকে বন্ধ ক'রে মাষ্টার-মশাই বললেন, 'আসি তবে, নমস্কার!'

বললাম, 'আসুন।'

যতীন বললে, 'আমিও তাহ'লে আসি বাবু! আপনি শুয়ে পড়ুন।'

বললাম, 'যাও।'

ব'লেই দরজা-জানালা বন্ধ করছিলাম, যতীন ফিরে এলো। বললে, 'অত অত টাকা এলো, আপনি একা থাকবেন বাবু, গুর্খা দুটোকে পাঠিয়ে দেবো?'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না।'

যতীন চলে গেল।

দরজা-জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকলে দম আমার বন্ধ হয়ে আসে। সেদিনও তাই একটা জানালা আমি খুলে রাখলাম। রেল-ষ্টেশনের জানালা, খুলে রাখা মানে সবই খোলা। ইচ্ছে করলে ও-পাশ থেকে টপ্‌কে যে-কেউ এসে ঘরে ঢুকতে পারে। আসুক-না! এলেই বা কি করবে? টাকা আছে লোহার সিন্দুকে। সিন্দুক একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা। আর ভূত যদি আসে, তাদের ত' শুনেছি সর্ব্বত্রই অবাধ গতি। তাদের কাছে খোলাই বা কি, আর বন্ধই বা কি! তারা অবশ্য টাকা নিতে আসে না। তাছাড়া, এলে এতদিন আসতো। এখনও যখন আসেনি, তখন সম্ভবতঃ আর আসবে না।

এমনি সব নানান কথা ভাবছি, আর সেই খোলা জানালার পানে তাকিয়ে আছি। আকাশে চাঁদ উঠেছে। দিনের মত পরিষ্কার জ্যোৎস্নার ছটা জানালার পথে ঘরে এসে পড়েছে।

ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ পরে জানি না, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, কাপড় দিয়ে কে যেন আমার মুখখানা চেপে ধরেচে। ঘুম ভেঙ্গে গেল, জেগে দেখি, সত্যিই তাই। হাত তুলতে গিয়ে দেখি, হাত দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা, পায়ের অবস্থাও তাই। ঘুমের ঘোরে কখন যে এমন ক'রে আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, কিছুই বুঝতে পারিনি! কথা কইবার উপায় নেই। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ চোখ দুটো খোলা। জানালার পথে যে জ্যোৎস্নার আলো ঘরে এসে পড়েছে, তাতে শুধু সেই জায়গাটাই দেখা যায়। যে-লোকটা আমার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সজোরে বেঁধে ফেলছে, তাকে আব্‌ছা আব্‌ছা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু চিনবার উপায় নেই। মুখ খুলতে পারছি না, তবু কোনোরকমে অস্পষ্ট-ভাবে গোঁ গোঁ ক'রে বললাম, 'টাকা নিয়ে যাও, কিন্তু আমায় তোমরা মেরে যেয়ো না বাবা!'

ওদিকে আমার মাথার পেছনে দেওয়ালের গায়ে সিন্দুক খোলার শব্দ পেলাম। আর করি কি! মড়ার মত চুপ ক'রে পড়ে আছি। মৃত্যু অনিবার্য্য। এতক্ষণে

বুঝলাম, আমার আগে যারা গেছে তারাও ঠিক এম্‌নি করেই গেছে। বুকের ভেতরটা ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করছে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! সে যে কি ভীষণ অবস্থা, তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না! চোখের সুমুখে আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তিনটির কচি মুখ ভেসে উঠলো, আমার স্ত্রীর কথা মনে হলো। হায় হায়, কেন আমি তাদের ছেড়ে এখানে এলাম। চোখ দিয়ে আমার দর্‌ দর্‌ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। —হে ভগবান্‌! এরা যেন আমায় প্রাণে না মারে। বেঁচে যদি থাকি ত' কালই আমি এ চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাব। টাকাগুলো মাথার কাছে ঝন্‌ ঝন্‌ ক'রে উঠলো। থলেটা তাহ'লে ওরা বের করেছে!

এমন সময় মনে হলো যেন জানালার পথে আর-একটা লোক ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো! চোখের জলে দৃষ্টি তখন আমার ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু যেন মনে হলো, আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা প্রকাণ্ড লম্বা সেই লোকটা—যাকে আমি প্রথম দিন ট্রেণে দেখেছিলাম।

গলাটা তখন কে যেন আমার দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে! এইবার মৃত্যু! অনুরোধ করবার শক্তি নেই। মুখের কাপড় তখন তেমনি বাঁধা!

কিন্তু অবাক্‌ কাণ্ড! মরতে মরতে আমি যেন বেঁচে গেলাম! লোকটা আমার গলা ছেড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে কার সঙ্গে যেন হাতাহাতি সুরু ক'রে দিয়েছে!

তার পরেই ভীষণ শব্দ! তার পরেই চীৎকার! মানুষ মরবার সময় যেভাবে চীৎকার করে, এও যেন ঠিক তেমনি! কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পারলাম, এ আমার গুর্খা চাপরাশী রামলাল!

মারামারি কিন্তু তখনও থামেনি; টাকার থলেটা মনে হলো একবার ঝন্‌ ঝন্‌ ক'রে মেঝেতে পড়ে গেল! তারপর কে যেন জানালা টপ্‌কে বাইরে বেরিয়ে গেল! তার পিছু-পিছু আর একজন! বাইরেও শব্দ হ'তে লাগলো। নিরুপায় ও অসহায় অবস্থায় আমি শুধু মড়ার মত সেইখানে চুপ ক'রে পড়ে রইলাম।

খানিক পরে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল!

কি যে হলো, কিছুই ভাল বুঝতে পারলাম না। তখনও বুকের ভেতরটা আমার কেমন যেন করছে! যে-কোন মুহূর্ত্তে মৃত্যু হ'তে পারে, সে কথাই ভাবছি।

এমন সময় ঝক্‌ ঝক্‌ শব্দ করতে করতে ঘরের বাইরে একখানা ইঞ্জিন এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ! বন্ধ দরজায় ঘা পড়তে লাগলো। কিন্তু কে খুলবে? আমার ত' ওঠবার উপায় নেই। মুখখানা টেনে বাঁধা! কথাও বলতে পারছিনে।

পায়ের শব্দ ঘুরে এদিকের খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। একজন সাহেব জানালা টপ্‌কে ঘরে ঢুকে দরজা খুলে দিলেন। ঘরে আলো জ্বালা হলো।

জংশন থেকে তাঁরা ইঞ্জিনে চড়ে চারজন এসেছেন। কোয়ার্টার থেকে ষ্টেশন-মাষ্টার এলেন।

ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে গেছে! গুর্খা চাপ্‌রাশী রামলাল মেঝের উপর মরে পড়ে আছে। তারই কোমরের ভোজালী তারই গলায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লোহার সিন্দুক খোলা। কিন্তু টাকার থলে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে।

ব্যাপারটা কিছুই ভালো বোঝবার উপায় নেই। কে যে আমায় মেরে ফেলে টাকা নিয়ে উধাও হবে ভেবেছিল, আর কেই-বা আমায় বাঁচিয়ে রামলালকে মেরে গেল, কে জানে!

সাহেবদের জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা খবর পেলেন কেমন করে?'

যিনি এখানে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বললেন, "জংশনে ইঞ্জিন আমাদের পেঁছবামাত্র এখান থেকে তার গেল, 'ডাকাত পড়েছে, জল্‌দি আসুন'।"

এখান থেকে তার করবে কে? ষ্টেশন-মাষ্টার টেলিগ্রাফের কাছে উঠে গিয়ে হাত দিয়ে তুলে আমাদের দেখালেন, কনেক্‌শন তিনি কেটে দিয়েই বাসায় গিয়েছিলেন।

অবাক্‌ হয়ে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

হঠাৎ আমার মনে হলো, ঝগড়াটা বাইরে পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে একবার দেখা যাক্‌।

সবাই মিলে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। জ্যোৎস্নার আলো তখন ম্লান হয়ে এলেও দেখা গেল, দূরে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের একেবারে শেষ সীমানায় সাদামত কি যেন একটা পড়ে রয়েছে!

কাছে গিয়ে দেখি, শিউশরণ! আমাদের দেখে সে শুধু কাঁদতে থাকে। মুখে কোনও কথা বলে না।

শেষে অনেক কষ্টে মেরে মেরে তাকে কথা বলানো হলো। সাহেবের লাথি খেয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে সব কথাই ব'লে ফেললে। আমায় মেরে ফেলে সে আর রামলাল, দু'জনেই এসেছিল টাকা চুরি করতে। এর আগে যে তিনজন মরেছে, তারাও তাদেরই হাতে মরেছে। কিন্তু এবার তার ফল হলো বিপরীত। মাঝখান থেকে কে একটা লোক এসে রামলালকে ত' মেরেই ফেললে, আর তার হাত থেকে টাকার থলেটা কেড়ে নিয়ে পা-দুটো তার উল্‌টো দিকে মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল।

বুঝলাম, সেই ভাঙ্গা পা নিয়ে অতি কষ্টে বুকে হেঁটে শিউশরণ পালাবার চেষ্টা করছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'লোকটা দেখতে কি রকম বল দেখি?'

শিউশরণ বললে, 'সে মানুষ নয় বাবু; তার গায়ে বহুৎ জোর। ইয়া লম্বা তালগাছের মত, আর ছাগলের মত মুখ।'

আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। মাথাটা তখন আমার কেমন যেন ঘুরছিল ব'লে সেইখানেই বসে পড়লাম। রামলাল যখন আমার গলাটা চেপে ধরে আমায় মেরে ফেলবার উদ্যোগ করছিল, তাকে তখন আমি জানালা টপ্‌কে ঘরে ঝুঁকতে দেখেছি। এমন সময় টুপ ক'রে আমার পায়ের কাছে কি যেন একটা পড়লো। তুলে দেখি—একটা দেশলাই-এর বাক্স। এইটেই সেদিন আমি তাকে ট্রেণের কামরায় দিয়েছিলাম, কিন্তু ফেরত দিতে সে ভুলে গিয়েছিল। এদিক্-ওদিক্ বহুদূর পর্য্যন্ত তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। সমস্ত শরীর তখন আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কে সে?

যে-ই হও, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। তোমায় নমস্কার!

ভৌতিক

—সুকুমার দে সরকার

চাকরীর অভাবে প্রত্যেক বেকার যুবকই যা ক'রে থাকে, আমিও তাই করতে বাধ্য হয়েছিলাম; অর্থাৎ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্সী। চাকরীর সঙ্গে ইন্‌সিওরেন্সের সম্বন্ধটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ—যথা, চাকরী থাকলে লোকে ইন্‌সিওর করে, আর চাকরী না থাকলে করে ইন্‌সিওরেন্স-এজেন্সী। আমিও সেই ফরমুলা অনুযায়ী যথানিয়মে এজেণ্ট্ হয়ে গেলাম। দেখতে দেখতে যত পুরনো বন্ধুর দল শত্রু হয়ে দাঁড়াল। জীবন-বীমাকারীর বদলে খেতাব পেয়ে গেলাম জীবন-বিষমাকারী। কাজে কাজেই বুঝতে হবে, আমি বেশ কৃতকার্য্য হয়েছিলাম এ লাইনে, এবং শেষ পর্য্যন্ত এই শেষের কাজটিতে এমন পাকা হয়ে উঠলাম যে, আমার কোম্পানী ঠিক করল—আমার মত পাকা লোকের মাত্র শুধু একটা সহরের লোকের জীবন বিষময় ক'রে ক্ষান্ত হলেই চলবে না, সারা বাংলার লোকেরই জীবন বিষময় ক'রে ছাড়তে হবে। ঘুরে বেড়াতে লাগলাম সারা বাংলাময়। অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

জীবন-বীমা নিয়মটা খুবই সুন্দর; কিন্তু ওই যে কোন-কিছু না পেয়ে, ভবিষ্যতের আশায় নিয়মিত টাকা দিয়ে যাওয়া অন্যান্য অভাব অপূর্ণ রেখেও—এটা সাধারণ লোক সহজে বরদাস্ত করতে পারে না।

যখনকার কথা বলছি, তখন বর্ষাকাল; মাত্র আগেরদিন মেদিনীপুর পেঁছেছি। হোটেলে আস্তানা। হোটেলের লোক তখনও আমার পরিচয় জানে না। সেদিনটা

সকাল থেকেই ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হোটেলের 'হল' ঘরটায় নানা রকমের লোক জড়ো হয়েছে। ম্যানেজারকে ব'লে-কয়ে সকলে সেদিন খিচুড়ীর ব্যবস্থা করেছিল। রাত্তিরের আহারটা আশাপ্রদ, তাই আড্ডাটাও জমেছে মন্দ নয়।

একজন বলল—এখন একটা ভূতের গল্প হ'লে মন্দ হোত না।

হোটেল-বাসীরা জীবনের পোড়-খাওয়া লোক। সকলকেই ব্যবসা বা অন্য কোন কাজের খাতিরে ঘুরে বেড়াতে হয়। সকলেরই অভিজ্ঞতা পাকা, জীবনকে নিজের হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে ভয় জিনিসটা আলোর সামনের অন্ধকারের মত প্রায় সকলের মন থেকেই অন্তর্হিত।

প্রথম বক্তার উত্তরে অন্য একজন জবাব দিল—আপনি ভূত মানেন রমেশবাবু?

ভূত কথাটার আর কিছু না থাক্, একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। দেখতে দেখতে ভূতের গল্প নয়, ভূত-মানা নিয়ে তর্কটা জমে উঠল।

রমেশবাবু—যিনি প্রথম কথাটা তুলেছিলেন, তিনি—ভূতের অস্তিত্বের-স্বপক্ষে ভোট দিলেন, আর ঘরের সকলেই প্রায় বিপক্ষে। অনেকে রমেশবাবুকে টিট্‌কিরী দিতে শুরু করলেন—হ্যাঁঃ, এই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীতে আবার ভূত? ভূত ব'লে কোন কিছু আছে নাকি?

আমি একপাশে চুপচাপ বসে ছিলাম। কারো সঙ্গে পরিচয় নেই, তাই আলোচনায় যোগ দিইনি। একজন হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কিছু বলছেন না যে?

আমি বললাম—কি বল্‌ব?

—আপনি ভূত মানেন?

প্রথমেই বলেছি, লোকে ভূত মানুক বা না মানুক, ভূত-সম্বন্ধে একটা কৌতূহল কিছুতেই মন থেকে যায় না। বাইরে ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; কোন্ বিদ্যুতের ঝলকটার পরই যে বাজের ভীষণ শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠবে, বলা যায় না। অমনি আবছা রহস্যময় আবহাওয়ায় মনটা ঘনিয়ে থাকে। এমনি একটা ঘনীভূত আবহাওয়া আমাদের ঘরে ঘনিয়ে রয়েছে। সকলেই ভূতের বিপক্ষে, শুধু রমেশবাবু ছাড়া। এখন আমার মতটা বিপক্ষে পেলেই সকলে রমেশবাবুকে কোণঠাসা ক'রে ছাড়তে পারে। একজন মানুষের অনবজ্ঞাত অভিমতের একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে।

সকলেই তাই উৎসুক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল। প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞাসা করল—আপনি ভূত মানেন?

আমি দমটা টেনে নিয়ে বললাম—মানি।

সমস্ত ঘরে যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলে গেল। রমেশবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর, যে আলোচনা থেমে যাবার উপক্রম হয়ে উঠেছিল, তাকে

পুনর্জীবিত হ'তে দেখে সকলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। প্রশ্নকারী বলল—ভূত মানেন আপনি?

—নিশ্চয়!

—আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন?

—দেখেছি বৈকি!

রমেশবাবু তাঁর কোন্ মামাত ভাইয়ের অভিজ্ঞতা বল্‌তে যাচ্ছিলেন, সকলে একজোটে তাঁকে নিরস্ত করলেন। তার পরে আবার আমাকে প্রশ্ন হলো—আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

গম্ভীরভাবে বললাম—হ্যাঁ। (বাইরে কড়্ কড়্ ক'রে বাজের আওয়াজ গর্জ্জে উঠল।)

—আপনার কোন রকম চোখের ভুল হ'য়ে থাকবে।—আশাজনক কণ্ঠে একজন বললেন।

বললাম—না।

—না মানে?

—ভূতের সঙ্গে আমি কথাও বলেছি।

—অ্যা?

—সত্যি?

—কি রকম?

—বলছি। এক কাপ চা হ'লে...

একজন সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করল—ওরে জগা, এক কাপ চা নিয়ে আয় ত'! সিগারেট খাবেন? —একজন সিগারেট বাড়িয়ে দিল। বাইরে বৃষ্টিটা আরও চেপে এসেছে। পথের আলোয় বর্ষা মিশে বাইরেটা রহস্যময়।

শুরু করলামঃ—

কাজের খাতিরে সেবার রাজীবগঞ্জ যেতে হয়েছিল।

একজন প্রশ্ন করল—কি কাজ?

—শুনুন না...রাজীবগঞ্জ একটা পাট-কেনার আড়ৎ। নানা রকম মহাজন নানা জায়গা থেকে আসে। কিছুদিনের জন্যে গ্রামটা বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। আমি হাট জমবার কয়েকদিন আগেই গিয়েছিলাম। নৌকো ক'রে যখন গাঁয়ে পেঁছলাম, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। খুঁজে-পেতে উইয়ে-খাওয়া ডাক-বাংলোটা বার করতে রাত হয়ে গেল। ডাক-বাংলোগুলো সাধারণতঃ লোকালয়ের বাইরে হয়। চৌকিদারকেও অনেক কষ্টে গ্রাম থেকে আনালাম।

—চৌকিদার ডাক-বাংলোয় ছিল না?—একজন জিজ্ঞাসা করল।

—তবে আর বলছি কি?...চৌকিদার এলে পরে তাকে ধমকে বললাম যে, এর মানে কি?...ডাক-বাংলো ছেড়ে সে অন্য কোথাও থাকে কেন? সে কোন জবাব

দিল না, বকুনী হজম ক'রে গেল। আমার খাওয়া-দাওয়া সারিয়ে দিয়ে সে বলল—বাবু, এবার আমার ছুটি?

জিজ্ঞাসা করলাম—তার মানে? তুই এখানে থাকবি না?

—না বাবু।

—কেন?

—ভয় আছে।

—ভয়? কিসের ভয়? চোর-ডাকাত?

—না বাবু!...লোকটা আমতা আমতা করতে লাগল।

—কিসের ভয়?...আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

—তেনাদের কি রেতের-বেলা নাম করা যায়?

আমি হো হো ক'রে হেসে উঠলাম—ও! ভূত? তাই বল্! ভূত আবার আছে নাকি? আমিও আপনাদেরই মত ছিলাম তখন। কিন্তু যাক্ সে-কথা, মোটের ওপর কোনমতেই চৌকিদারকে ধরে রাখা গেল না। সে সকালেই খবর নেবে ব'লে চ'লে গেল। আমি দরজা-জান্‌লা ভাল ক'রে দেখে-শুনে বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লাম। পাড়াগেঁয়ে অন্ধকার, কালো রাত বাইরে ঝিম্‌ঝিম্ করছে। নিকটেই নদীর ইসারা।

একজন বলল—আপনার ভয় করল না?

—কিসের ভয়?

—কেন, ভূতের?

—ভূতের আবার ভয় কি? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তখন কত রাত, খেয়াল নেই; হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে শুয়েছিলাম, বোধ হয়, তেল ভরে দিতে মনে ছিল না; দেখলাম, পোড়া পলতের মুখে নীল এক টুক্‌রো শেষ শিখা খাবি খাচ্ছে। ঠিক যেন কে তার গলা টিপে ধরেছে! ঘুমটা কেন ভেঙে গিয়েছিল, জানি না। তখন শীতকাল, হঠাৎ একটা ঝোড়ো হাওয়ায় গা-টা কন্ কন্ করে উঠল। পুরনো জান্‌লাটা খট্ খট্ ক'রে উঠল বাতাসে। জান্‌লা দিয়ে অজস্র তারা উঁকি মারছে; আর আকাশের টুকরোটা মিশ-কালো। হঠাৎ মনে হলো—জান্‌লা ত' আমি বন্ধ ক'রে শুয়েছিলুম, খুলল কে? হ্যারিকেনের আলো শেষ একবার দপ্ দপ্ ক'রে নিবে গেল। আর মনে হলো, জান্‌লা দিয়ে যেন একটা ছায়া ভেসে এসে ঢুকল ঘরে।

দম নিতে থামলাম। বাইরে আবার বাজের আওয়াজ। ঘর নিস্তব্ধ—ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়। হঠাৎ আমার খাটের কোণের দিক্ থেকে আমার লাঠিটা পড়ে গেল সশব্দে। স্পষ্ট মনে হলো, ঘরে কে যেন রয়েছে! খাটের ওপর উঠে বসে হাঁকলাম—কে? কে ওখানে?

জবাব এল—আমি।

—তুমি কে?

—আমি আমি!

—চমৎকার! তা, তুমি কে?

—বুঝতে পারছ না?

—পারলে আর জিজ্ঞাসা করছি?

—আমি ভূত!

—আমি বললাম—ও!

সে যেন চম্‌কে জবাব দিল—ও—মানে?

—মানে আবার কি? ও—মানে ও! অন্ততঃ ডিক্সনারীতে আর কোন মানে আমি পাইনি। তা, তুমি কি মনে ক'রে?

—কি আবার মনে করে?

—মানে, কি করতে এসেছ?

—ভয় দেখাতে।

—কেন?

—কেন আবার কি? ভূত ভয় দেখাবে না?

বললাম—ঠিক ঠিক! লাগাও লাগাও—দেখিয়ে দাও; তবে বেশী দেরী করো না, আমার ঘুম পাচ্ছে।

—তা, তুমি ত' দেখছি মোটেই ভয় পাওনি।

—না দেখালে পাব কি ক'রে?

মনে হ'ল, ভূতটা বেশ ঘাবড়ে গেছে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে-ই একটু থেমে বলল—আমি এসেছি।

—বেশ করেছ, বোস। তামাক খাবে?

ভূতটা গুঙিয়ে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হ'ল আবার?

অত্যন্ত করুণ সুরে সে বলল—তুমি যে মোটেই ভয় পাচ্ছ না!

—বাঃ রে, আমার কি দোষ? তুমি ভয় না দেখালে ভয় পাব কি ক'রে?

—আবার কি ক'রে ভয় দেখাব? আমি এসেছি, তাইতেই ত' তুমি ভয় পাবে!

—উঁহু, সে পাত্তর আমি নই।

—তবে তুমি কি পাত্তর?

—জবর একটা কিছু কর! অমন ভূতের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকো না।

—ভূত আবার ভূতের মত নয় ত' কিসের মত দাঁড়িয়ে থাকবে?

বললাম—ঠিক, আমারই ভুল। দাঁড়িয়ে থাকো তুমি।—ব'লে আমি পাশ ফিরে শুলাম।

হঠাৎ খাটটা দুলে উঠল। প্রথমে একটু, তারপরে আর একটু জোরে, তারপর বেশ দুলতে শুরু হ'ল। তন্দ্রা এসেছিল, ঘুম-জড়ান সুরে আস্তে আস্তে বললাম —কি হ'ল আবার?

—কি করছ? দাঁতকপাটি লেগেছে বুঝি?

ভূতের গলার আওয়াজ এবার বেশ সুপ্রসন্ন। বললাম—না, ঘুম এসে গিয়েছিল।

—অ্যাঁ, তুমি ঘুমোচ্ছিলে?

—তা, অমন চমৎকার দোলালে ঘুমোব না?

ভূতটা এবার হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

—আঃ, কি হ'ল? কান্না কেন?

—আমি কি করি গো—ও—ও? আমি এসেছি টের পেলেই ত' সবাই ভয় পায়, তার ওপর খাট দোলালে ত' রক্ষেই থাকে না! অনেকে আধমরা, কেউ কেউ মরেই যায়। ভূত-সমাজে আর আমার মান-সম্ভ্রম কিছু রইল না—ভূতের ফোঁপানি আর থামে না।

তাকে শান্ত করবার জন্য বললাম—দেখ ভূত, আজকালকার ছেলেরা ভূতকে ভয় করা দূরে থাক, ভূত মানেই না...

—অ্যাঁ, বল কি?

—হ্যাঁ, সত্যি কথা। আমি ত' তবু তোমায় মানছি, খাতির করছি!

—তুমি কে?

—কে আবার! মানুষ।

—না-না, তা নয়, তুমি কি কর?

—ইন্‌সিওরেন্স-এজেন্ট, খুব ভাল কোম্পানী, প্রিমিয়ম খুব কম...

গড়্ গড়্ ক'রে আমার কোম্পানীর সব গুণগুলো ব'লে গেলাম।

ব্যস্! এক চীৎকার ক'রে ভূত লাফিয়ে উঠল—অ্যাঁ, জীবন-বিষমাকারী? ওরে বাপ্!

হুড়মুড় ক'রে দরজা খুলে গেল। ভূত একদম হাওয়া! একটা দমকা হাওয়া মাঠের ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ ক'রে বয়ে চলে গেল নদীর দিকে। পৃথিবী অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ!

থামলাম।

ঘরের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠল;—জীবন-বিষমাকারী!—হোঃ হোঃ হোঃ!

আর একজন বলল—ভূত পালায় বাবা, কম নয়!

—সত্যি জ্বালাতনের একশেষ!

আর একজন জবাব দিলে—কিন্তু আখেরে কাজ দেয়। আর সুবিধেও দেখুন...

—তা সত্যি। হ্যাঁ, আপনার কি কোম্পানী যেন বললেন?

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর রমেশবাবু আমার ঘরে ঢুকে বললেন—পায়ের ধুলো দিন দাদা! চমৎকার ফন্দীটি করেছিলেন কিন্তু!

বললাম—তার মানে?

—আমারও ওই ব্যবসা দাদা, অন্য কোম্পানী; তবে আপনার কাছে আমার অনেক শেখবার আছে।

রমেশবাবুকে পায়ের ধুলো দিলাম।

—সরোজকুমার রায়চৌধুরী

অনেককাল আগের কথা। তখনও গ্রামে গ্রামে পাশ-করা ডাক্তারের এত প্রাদুর্ভাব হয়নি,—অন্ততঃ কুমারহাটিতে হয়নি। এখানে বড়-বড় কাবর্বাঙ্কল থেকে ছোট-ছোট ঘা-ফোড়া পর্য্যন্ত সকল রকম অস্ত্র-চিকিৎসা করতো মধু পরামাণিক। আর জ্বর-জ্বালায় ওষুধ দিতেন হংসেশ্বর ডাক্তার।

পাশ-করা ডাক্তার তিনি ছিলেন না, কিন্তু পসার ছিল যথেষ্ট। কারণ, এদিকে দশ-পনেরো মাইলের মধ্যে তিনিই একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্। বেঁটেখাটো মানুষ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ছোট-ছোট ক'রে ছাঁটা। তার মাঝখানে একটি পরিপুষ্ট শিখা! গলায় তুলসীর মালা। গ্রামের রোগী দেখতে একজোড়া মুচে চটি এবং একখানা চাদরই যথেষ্ট। বাইরে বেরুতে হ'লে একটা পিরান নিতেন। সুতির চাদরটাও বদ্‌লে মট্‌কা ব্যবহার করতেন। আর পায়ে দিতেন চীনেবাড়ীর জুতো।

এত পসার সত্ত্বেও ভদ্রলোক কিন্তু বিশেষ টাকা জমাতে পারেন নি। প্রথমত, তাঁর 'ফী' বলে কিছু ছিল না। দু-পাঁচজন ধনী রোগী ছাড়া বাকী প্রায় সর্ব্বত্রই আলুটা-বেগুনটা নিয়েই সন্তুষ্ট হ'তে হতো, ওষুধটা পর্য্যন্ত বিনামূল্যে। এ হেন ভালো মানুষ ভদ্রলোক একদিন কি বিপদে পড়েছিলেন, সে যদি শোনো, তোমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে।

সন্ধ্যেবেলায় পাশের গ্রাম থেকে একটা ডাক এলো, না গেলেই নয়। রোগীর অবস্থা শুনে ডাক্তারবাবু 'না' বলতে পারলেন না। দূর অবশ্য বেশী নয়। দুটি গ্রামের মধ্যে মাইল চারেকের একটা বিলের ব্যবধান। এই বিলটা-সম্বন্ধে চারি-পাশের লোকের অনেককালের ভয় আছে। বিশেষ ক'রে, বিলের মাঝামাঝি জায়গায়

যে বহুকালের বুড়ো বটগাছটা আছে, সেখানে যে অসংখ্য ভূতের বাস, তাতে আর কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু রোগীর বাড়ীর লোক যখন ভরসা দিলে যে, তারা নিজেরা তাঁকে পেঁছে দিয়ে যাবে, তখন আর ভয় করবার কি আছে? তিনবার দুর্গানাম স্মরণ ক'রে হংসেশ্বর ডাক্তার ভর-সন্ধ্যেবেলাতেই বেরিয়ে পড়লেন।

রোগী দেখে, ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে যখন ফিরলেন, তখন রাত দশটার বেশী নয়। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। তার ওপর সঙ্গে আলো নিয়ে আসছে দু'জন বিখ্যাত লাঠিয়াল। ডাক্তারবাবু নির্ভয়ে খোস-গল্প করতে করতে চলে আসছেন, —বরং বেশ ভালোই লাগছিল। যে বটগাছটার সম্বন্ধে সকলেরই ভয়, তারই নীচে দিয়ে আসতে, ভয়ে তাঁর গা ছম্ ছম্ করলেও কেমন একটু গর্ব্বও বোধ করছিলেন।

এমনি ক'রে আসতে আসতে যখন প্রায় গ্রামের সীমানায় এসে পেঁছেছেন, আর মাত্র মাইলখানেক বাকী, হঠাৎ একটা মস্তবড় ঘোড়া ছুটতে ছুটতে এসে প্রায় তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লো। এত রাত্রে হঠাৎ একটা ঘোড়া দেখে এঁরা তিনজনেই চম্‌কে উঠলেন।

ডাক্তারবাবু অবাক্ হয়ে সঙ্গের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, কার ঘোড়া হে? চমৎকার ঘোড়াটি তো!

একজন ঘোড়াটিকে ভাল ক'রে দেখে বললে, সম্ভব মদনপুরের বাবুদের। তাঁরা একটা নতুন ঘোড়া কিনেছেন শুনেছি। বোধহয়, সেইটে।

আর একজন বললে, জিন্-লাগাম পরানো! হয়তো রাস্তায় কোথায় সওয়ার ফেলে দিয়েছে!

ডাক্তারবাবুর ঘোড়ার খুব সখ। তিনি ঘোড়াটার গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বললেন, কিন্তু দুষ্ট ঘোড়া বলে তো বোধ হচ্ছে না!

একে ঘোড়ার সখ, তার উপর সমস্ত দিন হেঁটে হেঁটে তাঁর পায়ের আর কিছু ছিল না। ঘোড়াটি দেখে লোভ হচ্ছিল। এটায় চড়ে যেতে পারলে আর এই মাইল-খানেক হাঁটার দুর্ভোগ ভুগতে হয় না।

একজন সঙ্গী তাঁর মনের ভাব বুঝে বললে, যাবেন নাকি এইটাতে চড়ে? কাল সকালে খোঁজ করতে এলে ফিরিয়ে দিলেই চলবে।

ডাক্তারবাবু মনে মনে লোভে উস্‌খুস করলেও প্রকাশ্যে একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, সে কি হয়? কার-না-কার ঘোড়া! হয়তো বলবে—

চোখ পাকিয়ে লাঠিয়াল সঙ্গী বললে, বললেই হ'ল! আমরা কি চুরি করছি নাকি? যান্ তো চলে, যা হয়, সে আমরা বুঝব।

ব'লে ছাতি ফুলিয়ে দুটো ঘুসি মারলে। আসল কথা—এতে তাদেরও স্বার্থ ছিল। এইখান থেকে ডাক্তারবাবুকে ঘোড়ায় উঠিয়ে বিদায় করতে পারলে আর তাদের গ্রাম পর্য্যন্ত যেতে-আসতে হয় না।

ডাক্তারের নিজের তাগিদও কম নয়। সকাল সকাল বাড়ী ফেরা নিতান্ত

প্রয়োজন। দু'জন বিখ্যাত লাঠিয়ালের ভরসা পেয়ে তিনি আর দ্বিধা করলেন না। টপ্ ক'রে ঘোড়ায় উঠে বসলেন। ঘোড়া আস্তে আস্তে গ্রামের দিকে চলতে লাগল। তা দেখে লাঠিয়াল দু'জন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিজেদের গ্রমের দিকে ফিরে চলল।

* * * *

ডাক্তারবাবু এককালে বেশ ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলেন। এখনও ঘোড়া দেখলে তাঁর পা সুড়্ সুড়্ করে। অনেক দিন পরে ঘোড়া পেয়ে তাঁর ইচ্ছা হ'ল, একটা ভালো ছার্ত্তক দেন। হাতে চাবুক ছিল না, ছিল একটা ভাঙ্গা ছাতা। সেইটা দিয়ে আঘাত করতেই ঘোড়াটা তীরের মত ছুটলো! বহু ঘোড়ায় এককালে তিনি চড়েছেন, অনেক বদ্খেয়ালী তেজী ঘোড়া সায়েস্তা করেছেন। কিন্তু কোনো ঘোড়া যে এত জোরে ছুটতে পারে, এ তাঁর ধারণাই ছিল না। থামাবার জন্যে তিনি বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই থামানো যায় না। ঘোড়া তীরের মতো হাওয়া কেটে ছোটে। মনে হ'ল, মাটিতে যেন তার পা ঠেকছে না। এক-একখানা গ্রাম চক্ষের নিমেষে পাশ কেটে চলে যাচ্ছে!

বিলের রাস্তা—অর্থাৎ রাস্তা ব'লে কিছু নেই। কেবল বাবলার বন। তারই মধ্য দিয়ে ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে কোন্ দিকে যে ছুটছে, ডাক্তারবাবু কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। কেবল বাবলার বনের মধ্য দিয়ে ছুটতে দেখে মাথা নীচু ক'রে ঘোড়ার গলাটা জড়িয়ে ধরলেন। হঠাৎ একটু ভরসা হ'ল কিছুদূর আগে নদী দেখে। তিনি অনুমান করলেন, রূপসী নদী। কারণ, এদিকে আর বড় নদী নেই। চাঁদের আলোতে নদীর জল চক্চক্ করছিল। তা দেখে ভরসা হ'ল, এইবার ঘোড়াকে থামতে হবে। রূপসী প্রকাণ্ড বড় নদী। জলও যথেষ্ট। কিন্তু এটুকু ভাবতে তার যতখানি সময় লাগল, ততক্ষণে ঘোড়া নদীর ওপারে পেঁছেছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত ডাক্তারবাবুর জ্ঞান ছিল। কিন্তু ঘোড়া লাফিয়ে নদী পার হ'ল কি ক'রে বুঝতে পারলেন না। ভয়ে তাঁর সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেল। তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

এমনি ক'রে কতক্ষণ চলেছিলেন, জানেন না। হঠাৎ এক সময় দেখলেন, প্রকাণ্ড বড় এক রাজবাড়ীর দেউড়ীর ভিতর দিয়ে এসে গাড়ীবারান্দায় ঘোড়া থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন চাকর এসে ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরলে এবং আর একজন তাঁকে পরম সমাদরে নামতে ইঙ্গিত করলে। ডাক্তারবাবুর তখন জ্ঞান ছিল বলা চলে, ছিলও না বলা চলে। তিনি চোখ মেলে সব দেখছিলেন এবং কান দিয়ে সব শুনছিলেন, কিন্তু কিছুই পরিষ্কার ক'রে বুঝতে পারছিলেন না। চাকরের ইঙ্গিত মত তিনি তার পিছু পিছু বড় হল্-ঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন চাকর পা ধোয়ার জল, গামছা নিয়ে এল। ডাক্তারবাবু হাতমুখ ধুয়ে অনেকটা সুস্থ হ'লেন। তারপরে হল্-ঘরে গিয়ে বসলেন।

মস্ত বড় হল্। নীচে ঘরজোড়া ফরাস পাতা। অনেকগুলো তাকিয়া এখানে-ওখানে ছড়ানো। ওপরে ঝাড়ের আলোয় সমস্ত ঘর যেন ঝলমল করছে। আর সেই ঘরের মধ্যখানে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক চোখ বন্ধ ক'রে নীরবে আলবোলা টানছেন। তাঁর মাথায় প্রকাণ্ড বড় টাক ঝাড়ের আলোয় চক্‌মক্ করছে। পাকা আমের মত টুক্‌টুকে রঙ। গায়ে একটা ফিন্‌ফিনে হাত কাটা বেনিয়ান—বাঁ হাতে সোনার তাগাটা দেখা যাচ্ছে। পরণে দামী একখানা ধুতি। কেমন যেন বিমর্ষভাবে বসে আছেন! তিনি ডাক্তারবাবুর দিকে একবার তাকিয়েই নীরবে ঘাড় নেড়ে বসতে বললেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলেন। মরা ছাগলের মত এমন ঘোলাটে চোখ মানুষের দেখা যায় না। সে দৃষ্টিতে তাঁর হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল! তিনি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

ঘর নিস্তব্ধ!

কেবল দেওয়ালের বড় ঘড়িটা অশ্রান্তভাবে টিক্ টিক্ করছিল। ডাক্তারবাবু চেয়ে দেখলেন, রাত্রি মোটে বারোটা বেজে পাঁচ।

ভয় করবার কিছু নেই। এতক্ষণ মাঠে মাঠে ঘুরছিলেন, এখন বরং লোকালয়ে ভদ্রলোকের আশ্রয়ে এসে পেঁছেছেন। তবু কেমন একটা অজানা ভয়ে তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এক গ্লাস জলের জন্য কাকে বলা যায় ভেবে এদিক্-ওদিক্ চাইতেই একটা চাকর এসে রুপার গ্লাসে এক গ্লাস শরবৎ এনে তাঁর সম্মুখে নামিয়ে দিলে। ডাক্তারবাবু খুশী হ'য়ে তার দিকে চাইতেই তার চোখে চোখ পড়ে গেল। ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। তাঁর হাত কেঁপে উঠল। আশ্চর্য্য! এরও চোখ তেমনি ঘোলাটে!

কিন্তু তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। তিনি ঢক্ ঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে শরবৎটা পান করে ফেললেন। আঃ! এমন চমৎকার শরবৎ তিনি কখনও খাননি। শরীর যেন জুড়িয়ে গেল! তখনই আর একজন পান-তামাক নিয়ে এল। ডাক্তারবাবু তার চোখটা কি-রকম দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লোকটা যেন তাঁর মনের মতলব বুঝতে পেরে ফিক্ করে একটু হেসে চোখ নামিয়ে সরে গেল। ডাক্তারবাবু আর কিছু না বলে একটা পান মুখে দিয়ে তামাক টানতে লাগলেন। কোথাকার তামাক এটা? চমৎকার তামাক! খেতে খেতে চোখ বুজে আসে।

সেই বুড়ো ভদ্রলোক তখনও একমনে তামাক টেনেই চলেছিলেন। কিন্তু একটা কথাও বলছিলেন না। বাইরে বহু লোক-জন যাওয়া-আসা করছিল। কিন্তু তাদের কারও মুখে হাসিও নেই, কথাও নেই। আরও একটা আশ্চর্য্যের বিষয়, ডাক্তারবাবু যারই দিকে চেয়ে দেখেন, সবাই চোখ নামিয়ে চলেছে! এতগুলো লোক যে এ-বাড়ীতে রয়েছে, তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। কথা তো কেউ বলছেই

না, এমন কি, তাদের পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না! ডাক্তারবাবুর মনে হ'ল, এ-বাড়ীতে হয়ত কারও কঠিন অসুখ করেছে। হয়ত এখন-তখন অবস্থা! ব্যাপার দেখে কর্ত্তা বাইরে এসে গালে হাত দিয়ে বসেছেন। লোক-জনের মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না!

কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না এ-বাড়ীটা কাদের হতে পারে! এঁরা যে রাজা-বিশেষ লোক, তাতে আর সন্দেহ নেই। এদিকের বিশ-পঁচিশ মাইলের ভেতর প্রত্যেক গ্রাম কখনো-না-কখনো কোনো-না-কোনো উপলক্ষে তিনি দেখেছেন। ঘোড়া তাঁকে দু-ঘণ্টার মধ্যে এখানে এনে ফেলেছে। যত জোরেই ছুটুক, দু'ঘণ্টায় আর কতই বা রাস্তা যাওয়া যায়? বহু চেষ্টা ক'রেও এ-বাড়ী ডাক্তারবাবু আর কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। ব্যাপারটা বুড়ো ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করবেন মনে করছেন, এমন সময় খাবার ডাক এল। ডাক্তারবাবু খেতে গেলেন।

খাবারের আয়োজন দেখে ডাক্তারবাবুর চক্ষুস্থির! প্রকাণ্ড বড় সোনার থালায় খান-কয়েক ফুলকো লুচি। আর তার চারদিকে কত যে তরকারী থরে থরে সাজান, গরীব ডাক্তারবাবু কখনো তা চক্ষে দেখেননি। রাত হয়েছে, অতিরিক্ত পথশ্রমে ক্ষুধাও কম লাগেনি। তিনি আর কালবিলম্ব না করে বসে পড়লেন।

খেতে বসেই মনে হ'ল, সবই আছে বটে, কেবল এক টুকরা লেবু আর নুন নেই। কথাটা তাঁর মনে উদয় হওয়া মাত্র ঠাকুর এসে একটা রেকাবীতে করে নুন আর লেবু রেখে গেল। সব রান্নাই চমৎকার হয়েছিল, বিশেষ করে তপ্‌সে মাছ ভাজা বড় ভাল লাগলো। এদিকে তপ্‌সে মাছ পাওয়া যায় না। ভদ্রলোক কি করে কোথা থেকে যোগাড় করলেন, কে জানে?

ডাক্তারবাবুর মনে মনে হাসি পেল যে, ভদ্রলোক এত কষ্ট করে দুষ্প্রাপ্য তপ্‌সে মাছ যোগাড় করেছেন আর গল্‌দা চিংড়ী যোগাড় করতে পারেননি! চিন্তা করা মাত্র গল্‌দা চিংড়ীর মালাই-কারি এল। ডাক্তারবাবু কিন্তু এ-কথা ভেবে দেখলেন না যে, তিনি মনে মনে চিন্তা করা মাত্র কি করে এক একটা জিনিস এসে উপস্থিত হচ্ছে। ভাবলেন, বোধ হয় দিতে ভুলে গিয়েছিল, এখন এনে দিচ্ছে। ফলের থালাটা কোলের কাছে টেনে এনে দেখলেন, ফলের আর বাকী কিছু নেই, এক আম ছাড়া!

তা এবারে এদিকে আম মোটেই হয়নি। গোড়ায় মুকুল ভালোই হয়েছিল। কিন্তু ফাল্গুনের গোড়ায় ক'দিন কী যে কাল-বৃষ্টি হ'ল, একটি মুকুলও রইল না,—সব ঝরে গেল। আম নেই সেইজন্যেই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে মালদহের ভালো ফজলী আম যখন তাঁর সামনে এল, তখন আর তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। অবাক্ হয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে চাইতেই,—সেই চোখ!—মরা ছাগলের মত ঘোলাটে! ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে যেন অপ্রস্তুত হয়ে, হেসে চোখ নামিয়ে চলে গেল

বটে, কিন্তু সেই এক মুহূর্তের দৃষ্টিই তার হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপিয়ে দিলে।

ডাক্তারবাবু পরম পরিতোষ-সহকারে আহার করেও কেমন যেন তৃপ্তি পেলেন না। তাঁর মন তখন বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। কি যে করবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না! কস্তুরী-সুবাসিত পান মুখে দিয়ে সুগন্ধি তামাক টানতে টানতে একবার মনে হ'ল পালিয়ে যান! এই থম্‌থমে বাড়ী, বিশেষ ওই বুড়ো ভদ্রলোকটিকে তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। ভদ্রলোক এখনও ঠিক সেই জায়গায় ঠিক তেমনি করে বসে। মুখে গড়গড়ার নল। মাঝে মাঝে ডাক্তার-বাবুর মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোকের মাথাটা আসল মাথা নয়,—শ্বেত পাথরের কিংবা অমনি কোনো কিছু। কেবল থেকে থেকে ধূমপান করে প্রমাণ করছিলেন, না মাথাটা নকল নয় আসলই। কিন্তু ভদ্রলোক চোখ তুলে তাকান না কেন? কথাই বা বলেন না কেন? এ কি রকম ভদ্রতা?

এমন সময় ভিতর থেকে ডাক্তারবাবুর ডাক এল রোগী দেখবার জন্যে। রোগীর নামে ভদ্রলোক চাঙ্গা হ'য়ে উঠলেন। তাই বটে, বাড়ীতে কঠিন রোগী না থাকলে লোকে এমন বিমর্ষ হয়ে চুপচাপ থাকে না। ডাক্তারবাবু উৎসাহের সঙ্গে ভিতরে গেলেন। কত ঘর, কত বারান্দা যে পার হলেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। এত বড় বাড়ী রাজারাজী ছাড়া কারও হয় না। কিন্তু কোথাকার রাজা এঁরা? তিনি কি এঁদের নামও শোনেননি? কি জানি, এ কোন্ দেশ!

অবশেষে রোগীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রকাণ্ড বড় হল্-ঘরের এক প্রান্তে একখানা মেহগিনী খাটের উপর রোগী আপাদমস্তক একখানা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে। তার মাথার একরাশ চুল খাট থেকে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। মাথার শিয়রে একটি মোমবাতি মিট্‌মিট্ করে জ্বলছিল। সে আলোয় এত বড় হল্-ঘরের কিছুই আলো হচ্ছিল না, কেমন অদ্ভুত ধরণের ঝাপসা দেখাচ্ছিল! খোলা জানালা দিয়ে ঘরের স্থানে স্থানে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। ডাক্তারবাবু অবাক্ হয়ে দেখলেন, সেই বুড়ো ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই কি করে তাঁর আগে এসে ঘরের মাঝখানে বসে আছেন। এ ঘরেও মেঝেতে জাজিম পাতা। আর ভদ্রলোক —নীচের ঘরের মতো অবিকল তেমনি করে বসে,—চোখ নামানো, মুখে সেই গড়-গড়ার নল, নিঃশব্দে বসে।

কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ ডাক্তারও রোগীর সামনে চটপটে হয়ে পড়েন।

ডাক্তারবাবু একবার ঘরের চারিদিক তাকিয়ে যেন কোনো কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করেই রোগীর পাশের খালি চেয়ারটায় বসলেন। কারো দিকে না চেয়েই যেন দেওয়ালকে লক্ষ্য করে বললেন,—কদ্দিন থেকে অসুখ হয়েছে? অসুখটা কী?

কেউ জবাব দিলে না।

ডাক্তারবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন,—কই দেখি মা, আপনার হাতটা?

এতক্ষণে যেন রোগীর দেহে স্পন্দন দেখা গেল। কিন্তু মুখের ঢাকা খুললে না, বোধ হয় স্ত্রীলোক বলে।

ডাক্তার আরও এগিয়ে এসে আর একবার বললেন,—দেখি হাতখানা।

বলে হাত বাড়াতেই আর একখানা হাত চাদরের ভিতর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর হাতে এসে ঠেকল,—মাংসহীন হাত, আস্ত একখানা হাড়!

ডাক্তারবাবুর সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল! ভয়ে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাতি গেল নিবে! হা হা করে চারিদিক থেকে একটা বিকট আওয়াজ উঠল। মনে হ'ল, সে-শব্দে সমস্ত বাড়ীটা বোধ হয় হুড়মুড় ক'রে তাঁর মাথায় ভেঙ্গে পড়বে! আর চোখ বন্ধ করেও তিনি দেখতে পেলেন, হাজার জোড়া ঘোলাটে চোখ চারিদিকে হাওয়ায় নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, আর মিটি মিটি হেসে ইসারা করে তাঁকে যেন ডাকছে!

ডাক্তারবাবু অজ্ঞান হ'য়ে চেয়ার থেকে সশব্দে মেঝেয় পড়ে গেলেন।

যখন তাঁর জ্ঞান হ'ল, তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। দেখলেন বাড়ীটা বড় বটে, কিন্তু রাত্রে যে ঐশ্বর্য্য দেখেছেন, তার কিছুই নেই। দেওয়ালের চুন-বালি খসে খসে পড়েছে। ঘুলঘুলিতে হাজার হাজার চামচিকে বাসা বেঁধেছে। আর ঘরের মধ্যে ভীষণ একটা দুর্গন্ধ উঠেছে। মেঝেতে কাল যে জাজিম দেখেছেন, তার চিহ্নমাত্র নেই; সে লোকজনও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। ঘরের এক প্রান্তে একটা খাট আছে বটে,—কিন্তু মেহগিনীর নয়, একটা সাধারণ পায়া-ভাঙা তক্তপোষ! তার ওপরে যে ছেঁড়া তোষকটা আছে, তার থেকে ইঁদুরে তুলো বের করে ঘরময় ছড়িয়েছে। ডাক্তারবাবু প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসে বসলেন। চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার ফলেই হোক অথবা বহুদিন পরে ঘোড়ায় চড়ার জন্যেই হোক, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হচ্ছিল। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, যদি কারও দেখা পাওয়া যায়। এমন সময় দেখা গেল, একটি আধবুড়ো লোক আপন মনে হন্ হন্ করে আসতে আসতে হঠাৎ তাঁকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। এইবার ছুট দেবে বোধ হয়!

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি ডাকলেন—শুনুন মশাই, শুনছেন? এটা কোন জায়গা বলতে পারেন?

মানুষের গলা শুনে লোকটি যেন আশ্বস্ত হ'ল। তবে দূর থেকেই বললে,—মহেশপুর,—মালদ' জেলা।

—বলেন কি! সে যে অনেক দূর!

—তা বোম্বাই থেকে অনেক দূর বই কি। এখান থেকে কাছেই।

লোকটি এতক্ষণে কাছে সরে এল। হেসে বললে,—কোত্থেকে আসছেন? ডাক্তার বুঝি?

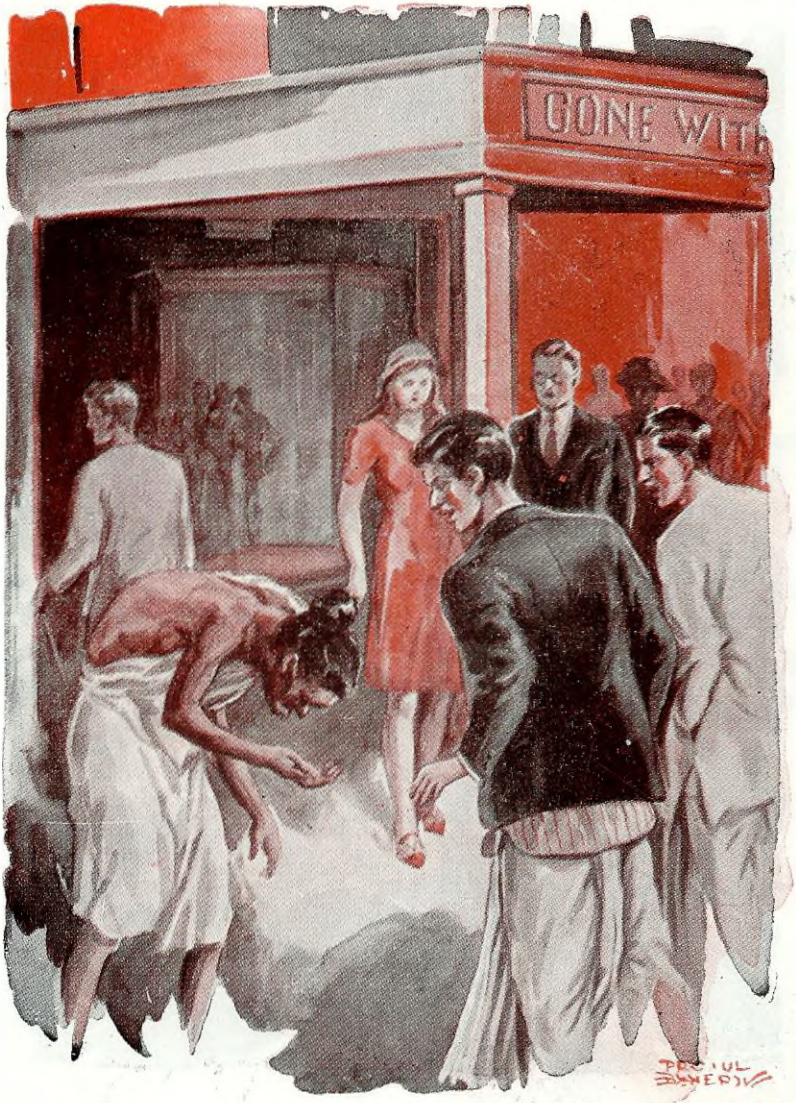

— আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো সেই বুড়ী, সেই তার কাদার গড়া হাতখানা বাড়িয়ে ধরলো, আমাদের সামনে !

কম্বলটাকে পেলাম, কিন্তু এবার আর কম্বল সরছে না

[পৃঃ ৮৯]

—হ্যাঁ, ডাক্তার। আসছি মুর্শিদাবাদ থেকে। জঙ্গীপুরের কাছে আমার বাড়ী।

—বুঝেছি!

—কি বুঝলেন বলুন তো? এইখানে বসুন।

লোকটি তাঁর কাছে ব'সে বললে—এই যে বাড়ী দেখছেন, এঁরা এককালে রাজা ছিলেন। ইদানীং অবস্থা খারাপ হয়ে আসছিল। কিছুদিন আগে গ্রামে হঠাৎ কলেরা লাগে। কলেরা জোর লাগতেই এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার একদিন রাত্রে প্রাণের ভয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সরে পড়েন। ঠিক সেই রাত্রেই রাজবাড়ীতে কর্ত্তাবাবুর একমাত্র মেয়ের কলেরা হ'ল। গ্রামে ডাক্তার নেই। চারিদিকে ঘোড়া নিয়ে লোক ছুটলো যেখান থেকে হোক ডাক্তার আনতে। কিন্তু ডাক্তার আর পাওয়া গেল না। কর্ত্তাবাবুর বড় পেয়ারের ঘোড়া, মশাই—অমন ঘোড়া আমার চোখে আজ পর্য্যন্ত পড়েনি,—মাঝ থেকে সেটারও যে কি হ'ল, রাস্তাতেই মারা গেল। আর ভোর হতে না হতে রাজবাড়ীর সমস্ত লোকও শেষ হ'য়ে গেল। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার মশাই, যেন ভোজবাজি!

কর্ত্তাবাবুর কথা উঠতেই ডাক্তার শিউরে উঠলেন। বললেন,—তারপর?

—তারপর আর কি মশাই! মাঠে কোনো ডাক্তারকে রাত্রে একা পেলে তাঁর আর রক্ষে নেই। আপনি একা নন, এর আগে আরও দু'-তিনজন ডাক্তার এমনি বিপদে পড়েছিলেন।

উঠতে উঠতে লোকটি বললে,—যাকগে, সে-সব কথা মশাই! একশো মাইলের ফেরে পড়েছেন। এবেলা আমার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করবেন চলুন, ওবেলা আপনার যাওয়ার যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

ডাক্তারবাবু উঠতে উঠতে বললেন—তাই চলুন।

ভৌতিক কাহিনী

—গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

কলকাতা থেকে দারজিলিং

—শিয়ালদা থেকে দারজিলিং মেলে শিলিগুড়ি—

শিলিগুড়ি থেকে ভাড়া-মোটরে দারজিলিং।

পুজোর ছুটিতে কলকাতা ছেড়ে আমাদের দারজিলিং আসা। আমাদের মানে—আমার ও আমার বন্ধু কমলের।

শিয়ালদায় রাত ন'টায় ট্রেণে চেপে ভোর আটটায় শিলিগুড়ি পেঁছলাম। শিলিগুড়িতে দশটার সময় ভাড়া-মোটরে উঠে বসলাম—ঘণ্টা তিন-চারের মধ্যেই দারজিলিং পেঁছে যাবার কথা। কিন্তু ঠিক সময়ে দারজিলিং পেঁছানো গেল না। ভাড়া-মোটর আমাদের সব রাস্তা নিয়ে যেতে পারেনি, বরং তাকেই আমাদের ঠেলে নিয়ে আসতে হয়েছে মাইল-কয়েক। কার্সিয়াং-এর কিছু আগেই মোটরের কল খারাপ হয়ে গেল। পাহাড়ে-রাস্তা ভেঙে আমাদেরই মোটর টেনে আনতে হল কার্সিয়াং-এ। তারপর ওখানে মোটর সারিয়ে দারজিলিং-এ আগমন।

দারজিলিং-এ যখন পেঁছলাম, তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। ছ'টার আগেই এখানে সন্ধ্যে হয়।

মাউণ্ট্ এভারেষ্ট্ হোটেলে আগেই চিঠি লিখে জায়গার ব্যবস্থা করেছিলাম। গিয়ে নাম বলতেই ম্যানেজার আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। ঘরখানা বেশ—দু'দিকে দু'খানা খাট—বিছানা-পত্তর—সে সব হোটেলের! ও-সব কিছুই আমাদের আনতে হয়নি।

জিনিষ-পত্তর রেখে হাতমুখ ধুয়ে নীচে খেতে গেল কমল—আমার আর খাওয়ার উৎসাহ ছিল না—পাহাড়ে-পথ মোটরে আসতে এবং মোটর ঠেলে নিয়ে আসতে দু'বার বমি করেছি। ভারী ঘুম পাচ্ছিল—আলো নিবিয়ে কম্বল টেনে শুয়ে পড়লাম—শোওয়া মাত্রই ঘুম!

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না—হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল—দেখি, গায়ের কম্বল গায়ে নেই—আমি শীতে কাঁপছি। কম্বলটা সরে গেছে বোধ হয়! পা দিয়ে অনেক খুঁজলাম—শেষে হাতড়াতে সুরু করলাম। কিন্তু কম্বল কই?

হাতটা একটু বাড়াতেই কম্বল পেয়ে গেলাম। সরে গেছে বোধ হয়! কম্বল ধরে টান দিলাম—কিন্তু কম্বল এলো না—কি ব্যাপার? জোরে আর একবার এক টান লাগাতেই কম্বলটা আলগা হয়ে আসছিল—কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন টেনে নিয়ে গেল কম্বলটাকে—টাগ-অব-ওয়ারে আমি হেরে গেলাম—দস্তুরমত চম্‌কে উঠলাম।

আবার হাতড়াতে সুরু করলাম—কম্বলটা পেলাম, কিন্তু এবার আর কম্বল সরছে না—হাতড়ে বুঝলাম, একটা লোক কম্বলটা গায়ে শক্ত করে জড়িয়ে শুয়ে আছে আমার পাশে।

"এ আবার কে?"—ভাবনা হ'ল। একটু ভয়ও পেলাম। "চোর-ডাকাত নাকি? —চোর-ডাকাত হ'লে শুয়ে থাকবে কেন? চোর ত' চুরি করে"—আমি ভাবতে থাকি, "হয়ত খুব শীত লেগেছে—এ হচ্ছে দারজিলিং-এর শীত—অন্ধকার একটু ফর্সা হলেই উঠে আমাদের ফর্সা করবার মতলব বোধ হয় ওর!"

সাহস করে ফের হাত বাড়ালাম, "এই যে দেখছি নাক—একটা নাক—হুঁ, একটা নাক-ই বটে!"

"হ্যাচ্চোঃ!"

কেমন করে আমার একটা আঙ্গুল ওর ওই একমাত্র নাকে ঢুকে যাওয়াতে এই বিপত্তি—আমার পাশের লোকটি হেঁচে দিল। আমি বেজায় রকম চমকে গেলাম—ভয়ও পেলাম খুব।

"এই যে দেখছি কান—একপাটি কান,—মলা যাক্ তা হলে—" মনের সুখে আর হাতের সুখে ওর কান মলতে থাকি—রাত-দুপুরে ভদ্রলোকের ঘরে চুরি করতে ঢোকার ফল, আর আমাকে হেঁচে ভয় দেখানোর শাস্তি,—"আঃ—উ-উ-ম্—" ভারী আরাম পাই আমি—ওর এটা কম্বল কেড়ে নেবার দণ্ড।

ভারী শীত। আমার এদিকে—গায়ে একটা গেঞ্জী ছাড়া আর কিছুই নেই।

ভাবলাম, ডাকা যাক্ কমলকে, তারপর দু'জন মিলে ওকে মেরে তাড়াব; ডাকাই যাক্!

"কমল—কমল!" খুব নীচু স্বরে ডাকলাম।

কমলের সাড়া নেই।

"কমল—কমল!" আগের চেয়ে একটু উঁচু পর্দ্দায় ডাকি।

কোন উত্তর নেই। ছেলেটা ভারী ঘুম-কাতুরে। ঘুমুলে ওর আর জ্ঞান থাকে না—একেবারে মড়ার মত ঘুমোয়।

"কমল—কমল—!" একটু গলা তুলি।

"উঃ!" কমলের খাট আমার বাঁ দিকে—সেখান থেকে উত্তর আসে খুব নীচু স্বরে।

"শোন্—!"

"কি?"

"দ্যাখ্ ভারী...!"

"কি দেখব—আর কেমন করেই বা দেখ্‌ব—যা সূচীভেদ্য অন্ধকার!"

"দেখতে হবে না—শোন্..." আমি চটে উঠি।

"কি?"

"ভারী মুস্কিল—একজন লোক এসে আমার কম্বল কেড়ে নিয়ে, খাটে আমার পাশেই শুয়ে আছে; আমি এদিকে শীতে মরছি!"

"আমারও খাটে একজন এসেছে—কিন্তু কম্বল কাড়তে পারে নি—একবার টেনে নিয়েছিল কেবল—ফের টেনে এনেছি—পাশে শুয়ে ভারী অত্যাচার শুরু করেছে।"

"ভারী শীত করছে ভাই,—কি করি?"

"আমার এখানেও দু'জন—তা না হলে এখানে শুতে পারতিস—আমার কম্বলটা ভাগাভাগি করে গায়ে দিতাম।"

"এখন কি করি তবে?—তোর খাটের সেই লোকটি ত' আমায় জায়গা ছেড়ে দেবে না!"

"এক কাজ কর্...।"

"কি?"

"কাতুকুতু দিয়ে তোর পাশের লোকের কাছ থেকে কম্বল কেড়ে নে।"

"ও ভাই আমি পারব না—কোথায় বগল কে জানে?...কম্বলের ভিতর আমি হাত ঢোকাতে পারব না—যদি হাত কামড়ে দেয়!"

"তবে এক কাজ কর্...!"

"কি?"

"তোর পাশের লোকটাকে তুই এক লাথি মেরে খাট থেকে ফেলে দে—আমিও আমারটাকে দেখছি।"

"আমি ভাই পারব না—আমার চেয়ে ওর গায়ের জোর ঢের বেশী—কম্বল নিয়ে টাগ-অব-ওয়ার করতে গিয়ে আমি তা টের পেয়েছি। ও তাহলে আমায় মেরেই ফেলবে!—কাছে যে ছোরা-ছুরি নেই, তাই বা কে বললে?"

"চেষ্টা কর্...!"

আমার খাটের অপর বাসিন্দা বোধ হয় আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল—সে আমাদের দু'জনার মধ্যে ছিল—অর্থাৎ আমার বাঁ পাশে। হঠাৎ এক প্রকাণ্ড লাথিতে আমি খাট থেকে পড়ে গেলাম!

"বাবাগো"—বলে আমি আর্ত্তনাদ করে উঠি ব্যথায়। আমার পিলে বোধ হয় ফেটেই গেছে ওর লাথির চোটে।

কমলের গলা শোনা যায় এতক্ষণে, "হ্যাঃ—হ্যাঃ—আমার সাথে চালাকি!—দিয়েছি ব্যাটাকে এক লাথিতে ফেলে, হ্যাঃ!"

"কমল—কমল!—" আমি কেঁদে ফেলি।

"কিরে, তোর কি হল?"

"আমাকে সেই পাজীটা খাট থেকে ফেলে দিয়েছে।"

"ঘাবড়াস না—আয় তুই আমার খাটে এসে শো—এই কম্বল দু'জনে গায় দেওয়া যাবে!"

"ভাই কমল!—বে-কায়দায় পড়ে আমার পা মচকে গেছে—আমি আর উঠতে পারছি না—।"

"দাঁড়া, আমি আসছি—।"

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল! কমল আমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে তার বিছানায় শোয়ালে।

"সেই লোক দুটো কই?" আমি কমলকে প্রশ্ন করি, "ওদের ধরে পিটুনি দিতে হবে!"

"কই, দেখছি না ত'!" কমল আলমারীর পাশ, চৌকির তলা—সব খুঁজে দেখে।

"পালিয়েছে—বোধ হয়—"

"কোথা দিয়ে পালাবে?"

"কেন? দরজা!"

"দরজা? দরজা দিয়ে কেমন করে পালাবে? দরজা দেখছিস না ভেতর দিয়ে বন্ধ!—পালাবার পর ভেতর থেকে কে দরজা বন্ধ করবে শুনি?" কমল চটে ওঠে!

"তবে তারা গেল কোথায়? অদৃশ্য ত' আর হয়নি!"

"কি জানি—ব্যাপারটা ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে।"

"না—না—ভূত নয় কক্ষনো"—আমি তীব্র প্রতিবাদ করি, "ভূত কখনো অমন করে হাঁচতে পারে না—ও রীতিমত হেঁচেছে—তার উপর—আমি ওর কান মলে দেখেছি—ওর কান রীতিমত মানুষের কান!"

"মানুষ হলে তারা যাবে কোথায় শুনি? মানুষ ত' আর ভূত নয় যে, হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে!—ও ভূতই—নিশ্চয় মানুষ সেজে এসেছিল।"

হঠাৎ আমার চোখ পড়ে আমারই পরিত্যক্ত বিছানার উপর। বিছানা একেবারে টান করে পাতা—বালিশ সব ফোলানো—কম্বল পায়ের নীচে ভাঁজ করা—যেন কেউ শোয়নি!

"কমল দেখ্‌ছিস?" আমি কমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি বিছানার দিকে!

"এ সব ভূতুড়ে কাণ্ড!"

"তা হবে।" আমি আমার দুঃখ ব্যক্ত করি, "শেষে ভূতের মার খেতে হল আমাকে...!"

"আমাকেই কি ছেড়েছে রে ভাই—!" কমল কাঁদ কাঁদ।

"তোকেও কি লাথি দিয়ে খাট থেকে ফেলে দিয়েছে নাকি?"

"না, তা দেয়নি—তবে কান মলতে কসুর করেনি—নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচিয়েছে—ভূতটা কম বজ্জাৎ!"

যাক্, আমার মনটা এতক্ষণে আশ্বস্ত হলো কিছুটা,—ভূতের হাতে মার আমায় একলা খেতে হয়নি!

—বুদ্ধদেব বসু

রবিবার দুপুরবেলা ব'সে-ব'সে হাই তুলছি। কোন কাজ নেই। গরমও পড়েছে বড্ড; আশ্বিন মাসে যখন প্রচণ্ড রোদ ওঠে আর একটু হাওয়া দেয় না, সেই দম-আটকানো, পিন-ফোটানো গরম। ভেবেছিলুম, আনকোরা টাটকা য়্যাডভেঞ্চার-গল্পের বইখানা পড়বো, কিন্তু দু'পাতা প'ড়েই মনে হচ্ছে কোথায় যেন আগে পড়েছি! ব'সে আছি চুপচাপ।

এমন সময় পা টিপে-টিপে অনুতোষের প্রবেশ। পা টিপে-টিপে—কেননা, মেজকাকা পাশের ঘরে দিবানিদ্রায় সচেষ্ট; যে-বেচারারা নেহাৎই ছেলেমানুষ, তারা যেন কোন রকমেও তাঁর সেই মহৎ চেষ্টায় বাধা না দেয়, এই হচ্ছে তাঁর তিন নম্বর আইন। এক আর দুই নম্বর এখন নাই শুনলে।

'কী রে অনুতোষ, কী মনে ক'রে?'

কপালের ঘাম মুছে অনুতোষ বললে, 'চল্।'

'কোথায়?'

'চল্, সিনেমা দেখে আসি।'

'পাগল! এই রোদ্দুরে!'

'কী যে বোকার মতো কথা বলিস্। মেট্রোর ভিতরটা কেমন ঠাণ্ডা! গরমের দিনে দুপুর কাটাবার জায়গাই যে ঐ।'

'আচ্ছা—চুপ কর্।' বাগ্‌বিতণ্ডা করবার উপায় নেই, পাছে মেজকাকার হুমকি

শুনতে হয়! মনের মধ্যে নানা রকম প্রতিবাদ ফোঁস ফোঁস করছে, তবু চুপ ক'রে থাকতে হ'ল।

'তবে চল।'

'পয়সা?'

'সেজন্য ভাবতে হবে না। ওঠ্ তুই। দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।'

মাকে ব'লে, এমন কি চার আনা পয়সা আদায় ক'রে নিয়ে, (এটা দিয়ে 'হ্যাপি বয়' খাওয়া হবে) বেরিয়ে পড়লুম অনুতোষের সঙ্গে। খাঁ খাঁ রোদ, গাছের পাতা নড়ে না। এদিকে বালিগঞ্জের রাস্তায় ট্রাম তো আর সহজে আসবে না।

একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি দু'জনে, এমন সময় একটা বুড়ী এসে আমাদের কাছে হাত পাতলো। ভিখিরীর জ্বালায় কোনখানে কি শান্তি আছে! আমরা একটু স'রে দাঁড়ালুম, কিন্তু ছায়াটুকু ছেড়েও যেতে পারিনে। বুড়ীটা আমাদের খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। এমনিতেই ভিখিরী দেখলে আমার বড় ঘেন্না করে, তার উপর ভিখিরীদের মধ্যেও অমন বীভৎস কঙ্কালমূর্ত্তি চট্ ক'রে চোখে পড়ে না। ও কিছু বললে না, ওর নুয়ে-পড়া শরীর থেকে যেন একখানা কাদায়-গড়া হাত বেরিয়ে এসে শূন্যে ঝুলে রইল। আমি ওর দিকে না-তাকাবার যতই চেষ্টা করলুম, ততই আমার চোখ ওর ওপরে গিয়ে পড়তে লাগল। বিশ্রী!

অনুতোষ বললে, 'দ্যাখ্, গরমে বুড়ীটা কেমন ধুঁকছে! ঠিক কুত্তার মতো!'

আমি বললুম, 'যাক্, ঐ ট্রাম এলো।'

'চল, বুড়ীকে মেট্রোতে নিয়ে যাই, খুব ঠাণ্ডা লাগবে', ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো অনুতোষ।

একটু পরেই আমরা ট্রামে চেপে বসলুম। ঢিকস্ ঢিকস্ চলেছে বালিগঞ্জের ট্রাম, সময় আর কাটে না। একযুগ পরে এসে পেঁছনো গেল। রাস্তাটুকু পার হ'য়েই মেট্রো। আজ বড্ড ভিড়, জোর ছবি দিয়েছে। ন' আনা টিকিটের জান্‌লায় ফিরিঙ্গি-বাঙ্গালী মিশিয়ে দশ-বারজন দাঁড়িয়ে। অনুতোষই আজ 'বস্' করছে; সে এগিয়ে গেলো টিকিট আনতে, আমি একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

টিকিট নিয়ে এলো অনুতোষ, আমরা ভিতরে ঢুকতে যাবো, এমন সময় ভাবতে পারো!—আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো সেই বুড়ী, সেই তার কাদায়-গড়া হাতখানা বাড়িয়ে ধরলো আমাদের সামনে! আমরা তো হতভম্ব!

'এ কী। ও এখানে এলো কেমন ক'রে?' বলে উঠলো অনুতোষ।

আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। এই মেট্রো সিনেমায়, সায়েব, মেম আর ঝক্‌ঝকে বাঙ্গালীর ভিড়ের মধ্যে ওকে যে কী বেখাপ্পা, কী বীভৎস দেখাচ্ছিল, তা আর কী বলবো! ওকে যে ওরা তাড়িয়ে দিচ্ছে না, সেটাই তো আশ্চর্য্য—এ-সব জায়গায় তো আর কোনোদিন ভিখিরী দেখি নি!

আমি বললুম, 'আমাদের ট্রামে ক'রেই উঠে এলো নাকি?'

অনুতোষ বললে, 'হ্যাঁ রে, ট্রামে এসেছে না রোল্‌স্‌ হাঁকিয়ে এসেছে!'

'তবে ও এলো কি ক'রে? উড়ে তো আর আসেনি?'

'নে, নে, আর মাথা ঘামাতে হবে না। চল্‌, ভিতরে বসি গে।'

বুড়ীটা কিন্তু সেই একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, একটি কথাও বলছে না, একটু নড়ছেও না। চারিদিকে এত লোক—ওকে কেউ লক্ষ্য করছে না কেন? আশ্চর্য্য!

ভিতরে গিয়ে ব'সে পড়লুম, কিন্তু মাথার মধ্যে কথাটা কেবলই ঘুরতে লাগলো! অনুতোষকে বললুম,—'দ্যাখ্‌, এ বুড়ী ঠিক সেই বুড়ীই তো?'

'মনে তো হ'লো ঠিক সেই রকমই। কে জানে! কলকাতায় কত ভিখিরী আছে, হ'তেও পারে এ আর-একজন। কিন্তু এক্কেবারে এক রকম।'

'যদি ও-ই হয়—কী ক'রে এলো বল্‌ তো! আশ্চর্য্য না?'

অনুতোষ চুপ ক'রে রইলো।

'তা ছাড়া', আমি চুপি-চুপি বললুম, 'আমার মনে হচ্ছিল, আমরা ছাড়া আর-কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না।'

অনুতোষ হেসে উঠলো। 'তোর মাথা খারাপ হ'লো নাকি রে?'

'তবে ওকে ওরা তক্ষুণি তাড়িয়ে দিলে না কেন?'

'কী যে বলিস—ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়ে নি আর কি! নে, চুপ কর। আরম্ভ হ'লো।'

একটা বেগ্‌নি রঙের ঠাণ্ডা অন্ধকারের মধ্যে ব'সে সিনেমা দেখতে লাগলুম। নিউজ্‌-রীল হ'য়ে গেলো, আরম্ভ হ'লো, দিগ্বিজয়ী ছবি। অনেকক্ষণ এক মনে দেখছি, হঠাৎ কী-রকম অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলুম। ছবির পর্দা থেকে আমার চোখ নেমে এলো প্রেক্ষাগৃহে। আধো চাঁদের আকারে চেয়ারের পর চেয়ারের সারি—কত রকম লোক ব'সে—এ-ও দেখতে মন্দ লাগে না। তারপর হঠাৎ যেন আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেলো।

ঠিক আমাদেরই সারিতে, আমাদের কয়েকটা চেয়ার পরে, সেই বুড়ী ব'সে। স্পষ্ট দেখলুম সেই রঙিন অন্ধকারে। ঠিক সে বসেছে চেয়ারে, শরীর নুয়ে-পড়া, একখানা কাদায়-গড়া হাত সামনের দিকে বাড়ানো।

আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেলো, কিছুতেই চোখ সরিয়ে নিতে পারলুম না।

অনেকক্ষণ পর আস্তে একটা ঠেলা দিলুম অনুতোষকে। ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললুম, 'ঐ দ্যাখ্‌।'

'কী?'

'ঐ যে—' আমি আঙুল বাড়ালুম ওদিকে, কিন্তু তার আগেই অনুতোষের মুখ একেবারে সাদা হ'য়ে গেলো।

হয়তো আমাদের চোখের ভুল, হয়তো আমাদের দু'জনেরই মাথা-খারাপ হয়েছে।

জোর ক'রে আবার সিনেমা দেখতে লাগলুম; অর্থহীন কতগুলো ভেল্কি-বাজি নেচে যাচ্ছে চোখের সামনে। একটু পর-পরই আমরা তাকাচ্ছি ওদিকে—হ্যাঁ, ঠিক ব'সে আছে বুড়ী, শরীর নুয়ে-পড়া, একখানা কাদার মতো হাত সামনে বাড়ানো! মেট্রো সিনেমার ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে ব'সেও ঘেমে জল হ'য়ে গেলুম।

হঠাৎ অনুতোষ বললে—'আর না, চল্।'

আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম। উঠে দাঁড়ালুম দু'জনে, নুয়ে-নুয়ে কয়েকটা পা মাড়িয়ে, দু'-একটা হাঁটুতে ধাক্কা দিয়ে বাইরে এসে যেন বাঁচলুম। পিছন ফিরে তাকালুম না একবারও। এক দৌড়ে এক্কেবারে রাস্তায়!

বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, বিরাট্ সহর, আর লোক, কত লোক!

ফিরতি ট্রাম ধরলুম। সারা রাস্তা দু' বন্ধু এক্কেবারে চুপ। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কেমন একটা ভয় যেন গলা আঁকড়ে ধরলো! আবার যদি সেইখানে, সেই গাছের ছায়ায় ওকে দেখি! কিন্তু না—কিছু নেই, কেউ নেই। বাড়ি ফিরেও শান্তি নেই, হঠাৎ যদি আবার—! রাত্তিরে ভালো ঘুম হ'লো না।

পরের দিন খেতে ব'সে মা বললেন, 'কী কাণ্ড! কাল দেখি, আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় গাছের নীচে একটা বুড়ী ম'রে প'ড়ে আছে।'

বাবা বললেন, 'কত হচ্ছে এ-রকম!'

'ম'রে পড়েই আছে—কতক্ষণ পর কর্পোরেশনের লোক এসে নিয়ে গেলো।'

আমি বল্লুম, 'কখন্ বলো তো?'

'এই তো দুপুরবেলা—তুই বেরিয়ে গেলি, তার একটু পরেই। কী বিশ্রী দেখতে। ও কি? তোর খাওয়া হ'য়ে গেলো?'

আমি তাড়াতাড়ি পাতে জল ঢেলে বললুম, 'আর খাবো না।'

'কী হ'লো তোর?'

'কিছু হয় নি' ব'লে আমি উঠে পড়লুম।

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নীচে প্রায় সদর দরজার কাছেই ছোট্ট একটা ঘরে বিনোদ শোয়,—এবং একা শোয়, নীচেটা একদম ফাঁকা, তবু কিছুতে বিনোদের ভয় নেই। সেদিন তাদের পাশের বাড়ির ছাদে যে একটা জলজ্যান্ত খুন হ'ল—এত হৈ-চৈ, এত কান্নাকাটি—এবং তারই ঘরের পাশের গলি দিয়ে যে সেই রক্তাক্ত মৃতদেহটা মোটরে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল—এতেও বিনোদের ঘুম ভাঙেনি। মা তাকে জাগাতে এলে বলেছিল,—পায়ের দিকের জানালাটা খুলে দাও, যা গরম আজ!

মা বললেন,—তুই ওপরে চল্, আমার কাছে শুবি!

বিনোদ পাশ ফিরে বললে,—কিসের তোমার ভয়! এত গোলমালে সেই খুনেটা ত' আর ঘুপটি মেরে ব'সে থাকেনি, কখন দিব্যি সরে পড়েছে। সে আবার এখানে ফিরে আসবে নাকি?

মা অবুঝের মত বললেন,—না, তুই চল্ ওপরে। তুই এ ঘরে একা থাকিস্ বলে' রাত্রে আমার ঘুম হয় না। চ্যাঁচালেও শুনতে পাবো না।

—চ্যাঁচানি তোমাদের শুন্‌তে দেব নাকি ভেবেছ? যদি ব্যাটা আসে, টুঁটি টিপে তার দম বন্ধ করে' দেব না?

তার দিদি বললেন,—কিন্তু যাকে মেরেছে, সে যদি জান্‌লা দিয়ে এসে মুখ বাড়ায়?

বিনোদ হেসে বল্‌লে,—তার মুখটা ভালো ক'রে দেখবার জন্যই ত' পায়ের

দিকের জান্‌লাটা খুলে রাখতে বললাম। মুখ যদি বাড়ায়-ই তবে নেহাৎ না হয় দুটো গল্প করা যাবে।

কিছুতেই বিনোদের ভয় নেই। তার স্কুলের বন্ধুরা কত ষড়যন্ত্র করে' তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে' রাত্রিবেলা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মশারির দড়ি নাড়ে, ঢিল ছোঁড়ে, বিকট স্বরে হরিবোল দেয়, চাকরের হাতে পয়সা গুঁজে দরজা খুলিয়ে ওর তক্তপোষের তলায় গিয়ে লুকোয়,—গোঁ গোঁ করে, ঠুক্‌-ঠাক্‌ দুম্‌ দাম্‌ শব্দ করে, কিন্তু বিনোদের যেই ঘুম সেই ঘুম। শেষকালে আরশুলার উৎপাতে ওরাই বেরিয়ে আস্‌তে পথ পায় না, গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলে, কিছুতেই তোকে ভয় দেখাতে পারলুম না বিনু!

বিনোদ হেসে বলে—দুবেলা যে নিয়মিত ডন-বৈঠক করে, তার আবার ভয় কি? খেয়ে হজম করি আর গভীর করে' ঘুমাই—

শেষকালে অভয়কে বলতে হয়,—একা-একা বাড়ি ফিরে যেতে আমারই এখন ভয় হচ্ছে!

বিছানা থেকে ঝট্‌ করে' লাফিয়ে উঠে বিনোদ বলে,—চল্‌ তোকে বাড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

রাত তখন প্রায় বারোটা! রাস্তা-ঘাট নিঝুম! বিনোদ তার বিছানায় অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এমন সময় সদর দরজার কড়া ন'ড়ে উঠ্‌লো। কে যেন গলা খাঁখরে ডাকলে—বিনু, বিনু!

সাধারণতঃ এত সহজে বিনোদের ঘুম ভাঙে না, কিন্তু সেই অস্ফুট কণ্ঠের ডাক শুনে চট্‌ করে' তার ঘুম ভেঙে গেল। এমন অনেক কালা আছে চেঁচিয়ে কথা বললে তার এক বর্ণও যারা শুনতে পায় না, কিন্তু চলন্ত ট্রেনের শব্দের মধ্যেও আস্তে তাদের একটু নিন্দে করলে তেড়ে উঠে বলে,—কী বললে? ভাবো, আমি শুনতে পাই নি?...বিনোদেরও আজ সেই দশা! চুপি-চুপি কেউ তাকে ভয় দেখাতে এসেছে বুঝি? কিন্তু সব সময়েই সে সাবধানী! জোরে ডাক্‌লে সে তেমনি ঘুমোয় বটে, কিন্তু আস্তে ডাকলে জেগে উঠতে জানে।

পাছে লোকটা সাড়া পেয়ে পালায়, বিনোদ তাই কোনো কথা না বলে' হাতে একটা লক্‌লকে বেত নিয়ে নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে দিল।

সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে অভয় হাসছে।

বিনোদ ত' অবাক! বললে,—তুই এই সময়? এত রাত্রে? কী দরকার?

অভয় ভিতরে ঢুকে বললে,—সাড়ে ন'-টার শো-তে বায়োস্কোপে গিয়েছিলাম। এই ফিরছি।

—বাড়ি যাস্‌ নি?

অভয় চাপা গলায় বললে,—বাড়ি আর ফিরবো না।

—কেন, কী হলো?

—বাবা-মা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন!

বিনোদ বিস্মিত হ'য়ে বললে,—তাড়িয়ে দিয়েছেন! কেন? কী অপরাধ—?

—অপরাধ আবার কী! ও-বাড়ীতে আমার আর পোষাবে না।

তারপর ঘরের চৌকাঠের দিকে পা বাড়িয়ে বল্‌লে—চল্‌ ভেতরে, বলছি।

ঘরের এক কোণে ক্যানভাসের একটা ইজি-চেয়ার, তার উপর বসে' অভয় বললে, —তোর এখানে আজ আমি শোব। দিবি ত' শুতে?

বিনোদ আলো জ্বালালো। বললে,—স্বচ্ছন্দে!

আলোতে বিনোদ দেখলে অভয় অত্যন্ত অদ্ভুত সেজেছে। গায়ে গরদের পাঞ্জাবির ওপরে দামী শাল, পরণে নীল সিল্কের ধুতি, পায়ে জরির জুতো, হাতের কব্জিতে সোনার রিষ্ট-ওয়াচ বাঁধা। সারা গায়ে এসেন্সের গন্ধ ভুর্‌-ভুর্‌ করছে—পরিপাটি করে' টেরি বাগানো। ডান হাতের আঙুলে হীরের একটা আংটি।

বিনোদ বললে,—এত সেজে-গুজে বেরিয়েছিস্‌! চেহারা দেখে ত' ত্যাজ্য-পুত্তুর হয়েছিস ব'লে মনে হয় না!

অভয় হেসে বললে,—বাবা-মা বাড়ি থেকে বা'র করে দিলেন বটে, কিন্তু যত-কিছু আমার জিনিস ছিল, সব সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বললেন,—এই নাও তোমার জিনিস-পত্তর, আর এ-মুখো হয়ো না বাছাধন! যেখানে খুসি বেরিয়ে পড়। সেই যে জাপানি বাক্সটায় রোজ দু'আনা চার আনা করে' জমাতাম বিনু, সেই বাক্স ভেঙে সব খুচরো সিকি-আধুলি আমার পকেটে দিয়ে দিয়েছেন। বললেন—যেখানকার খুসি টিকিট কেটে ভেসে পড়, তোমার ঐ কালো মুখ আর দেখতে চাইনে।

বিনোদ বিছানায় বসে' অভয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। পরে বললে,—কিন্তু কী তুই করেছিলি শুনি?

—বল্‌ছি। অভয় হাত বাড়িয়ে বললে,—তোর ম্যাপের বইটা দে ত'?

—কী করবি?

—একটা জায়গা খুঁজে বের করবো। খুব দূরে—যেখানে মানুষ সহজে যেতে চায় না। ধর, গ্রীন্‌ল্যান্ড—বছরে ছ'টা মাস সেখানে রাত, কঠিন বরফের দেশ—পড়িস্‌নি ভূগোলে?

বিনোদ হেসে উঠলো। বললে,—কিন্তু পকেটে মাত্র ত' কয়েকটা টাকার খুচরো দেখতে পাচ্ছি। ঐ নিয়ে তুই গ্রীন্‌ল্যান্ডে যাবি?

টেবিলের উপর 'য়্যাট্‌লাসটা' পড়ে ছিল, সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে অভয় পাতা উল্‌টোতে লাগলো। বললে,—এমন জায়গায় যাবো, যেখানে যেতে ভাড়া লাগে না।

বিনোদ হেসে বললে,—আপাততঃ দেখছি সে ত' আমার শোবার ঘর। তুই

পাগলামি করিসনে অভয়। চল, তোকে বাড়ি রেখে আসি। বাবা বকে থাকেন, এখন নিশ্চয়ই ব্যস্ত হ'য়ে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

অভয় বললে,—খুঁজুন গে! কিন্তু একবার যখন বেরিয়েছি, আর আমি ফিরছি না। জাহাজে করে' আমি স্পেনে যাবো, সেখান থেকে কলম্বাসের মতো নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করতে বেরুব। জাহাজ না পাই, সঙ্গী না জোটে, তবু আমি পেছ-পা হ'ব না। নে, আলোটা নেবা—আজ রাতটা ত' এখানে ঘুমোই!

বিনোদ বললে—আমার বিছানায় উঠে আয়। দু'জনে খুব ধরবে।

অভয় বললে,—না, না, আমি চিৎ হ'য়ে আরাম ক'রে শুতে পারবো না, আমার মেরুদণ্ডে খুব চোট লেগেছে। এই বেশ ঘুমোতে পারবো এখানে। একটা বালিশ এগিয়ে দে দেখি।...ব'লে সে নিজেই আলো নিবিয়ে একটা বালিশ টেনে পিঠের তলায় রেখে আবার বললে,—নে তুই এখন শুয়ে পড়। ঢের রাত হয়েছে। কাল ভোরে উঠে চা খেতে-খেতে না হয় কর্ত্তব্য ঠিক করা যাবে।

বিনোদ বললে,—এমনি তোর ঘুম আসবে? হতভাগা, উঠে আয় ওপরে।

অন্ধকারে অভয় খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠলো, বললে,—পাগল! ঘুম আসবে না কী! ইস্কুলে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে পর্য্যন্ত ঘুমুই, আর এ ত' দিব্যি মোলায়েম একটি চেয়ার! কলম্বাসের মতো যে দেশ-জয়ে বেরুবে, তাকে খালি গায়ে শীতের রাতে শুকনো কাঠের ওপর শুলেও বেমানান দেখাবে না। থাম, তোকে আর বকাবো না, ঘুমো!

বিনোদের একটুতেই ঘুম আসে, কিন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে' চোখ বুজে থেকেও কিছুতেই আজ তার ঘুম এলো না। অভয়ের সঙ্গেই আরো খানিকক্ষণ গল্প করা যাক্। চোখ না মেলেই ডাকলে—অভয়!

অভয়ের কোন সাড়া নেই। মেরুদণ্ডে চোট পেয়েও ঘুমের তার এক বিন্দু ব্যাঘাত হয়নি। আবার ডাকলে,—অভয়!

সেই অন্ধকার কালো রাত্রি, আর সেই স্থূল নিঃশব্দতা!

বিনোদ লাফিয়ে উঠে বসলো। ঘরে কেউ নেই! ম্যাপের খাতাটা মেঝের উপরে উল্টানো, চেয়ারের উপরে বালিশটা কুঁচকে পড়ে' আছে! দরজাটা খোলা।

বিনোদ ঘর ছেড়ে সদর দরজার কাছে এলো—সদর দরজাটাও দু'-ফাঁক। অভয় আবার কখন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেছে!

দুষ্টু ছেলে তাকে ভয় দেখাবার নতুন ফন্দি করেছে বুঝি! কিন্তু বিনোদ দমবার পাত্র নয়। গরম কোটটা গায়ে দিয়ে সে রাস্তায় নামলো। কোথাও একটা জনপ্রাণী নেই, নিজের দ্রুত ও সশব্দ নিঃশ্বাস ছাড়া একটা সামান্য শব্দও কোথাও শুনতে পাচ্ছে না।

আবার সে ডাকলে,—অভয়!

মুহূর্ত্ত-মধ্যে তার খুব কাছে খিল্-খিল্ করে, কে খুব জোরে হেসে উঠলো

এবং সেই খণ্ড-খণ্ড হাসির ঢেউ মিলিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠলো অভয়। বিনোদ বললে,—কোথায় গেছলি?

—বাঃ, এইখানে তোর পাশেই ত' দাঁড়িয়ে ছিলাম! ঘরের মধ্যে ভীষণ গরম—অত গরমে কখনো ঘুম আসে!

গরম কি রে পাগলা? এই কন্‌কনে শীতের রাতে তোর গরম লাগছে?

অভয় হেসে বললে,—গরম বলে' গরম! চারিদিকে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠছে। টিকতে পাচ্ছি না! চল্‌, রাস্তায় একটু হাঁটি!

বিনোদ ভাবলে, মন্দ নয়, বেড়াতে-বেড়াতে গল্পের ফাঁকে অভয়কে তাদের বাড়ির দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে পূর্ণবাবুকে ডেকে তাঁর ছেলেকে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেবে।

বিনোদ বললে,—চল্‌, কিন্তু সদর দরজাটা যে খোলা থাকবে? দাঁড়া, ভজুয়াকে বলে' আসি বন্ধ করে' দিতে! থাক্‌গে, ডাকতে গেলেই আমার মা টের পাবেন। ভেজিয়েই আসি দরজাটা! খানিক বাদেই ত' ফিরে আসছি, কী বল?

অভয় বললে,—তোর ভাবনা কী। তোকে ত' আর বাপ-মা তাড়িয়ে দেয়নি! আমারই জন্য না হয় বাড়ির দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

দু'বন্ধু বড় রাস্তায় এসে পড়লো। কারুর মুখে কোনো কথা নেই! বিনোদ ভয় পেয়ে বললে,—এবার ফের।

অভয় হেসে বললে,—কোথায়? এই ত' বেশ যাচ্ছি।

খানিক দূরে কয়েকজন লোক এদিকে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। একজনকে বিনোদের মনে হ'ল খানিকটা পূর্ণবাবুর মতো দেখতে। লোকজন নিয়ে ছেলের খোঁজে বেরিয়েছেন নিশ্চয়! অভয়কে এবার স্বচ্ছন্দে ধরিয়ে দেওয়া যাবে। গায়ের জোরে বিনোদের সঙ্গে কখনই এঁটে উঠবে না।

লোকগুলো না বেঁকে সামনে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে দেখে বিনোদ ভরসা পেলে। অভয়কে বুঝতে না দিয়ে বললে,—হ্যাঁ, আরো একটু বেড়াই আয়।

অভয় বললে,—কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। বাবা ঐ এসে পড়লেন। তোর কাছে আমি সেই সাত আনা পয়সা ধারতুম না—সেই যে রেষ্টুরেণ্টে খাইয়েছিলি? এই নে, চট করে'—বলে, সে পকেট হাত্‌ড়ে কতকগুলো পয়সা বার করলে, বললে,—গুণে নে, শীগ্‌গির! বাবা, মেজদা, ন'-কাকা, রাম খুড়ো—সব এসে পড়লেন যে! দেরি নয়, শীগ্‌গির তুলে নে পয়সাগুলো আহাম্মক—বলে' পয়সা-ভরা হাত মেলে অভয় কাঁপতে লাগল। এখুনি সে যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাবে!

বিনোদ এরি জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত ছিল। গায়ের জোরে তার সঙ্গে তাদের স্কুলের ছাত্র দূরের কথা, মাষ্টাররাই পেরে ওঠেন না। সে তাড়াতাড়ি অভয়কে দুই শক্ত হাতে জাপটে ধ'রে বললে,—কিন্তু কোথায় তুই যাবি? তোকে ধরিয়ে দেব না আমি?

কিন্তু কোথায় অভয়? বিনোদ দু'হাত দিয়ে নিজেরই বুকটা জোরে চেপে ধ'রে নিজের সঙ্গে অকারণ ধস্তাধস্তি করছে।

অভয় কোথাও নেই। কখন টুপ্ করে' সরে' পড়েছে! নিশ্চয় এই পাশের গলি দিয়ে। এখনো ছুটলে তাকে ধরা যায়। দেখতে দেখতে পূর্ণবাবু দলবল নিয়ে কাছে এসে পড়লেন। বিনোদ তখন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

পূর্ণবাবুকে দেখে তার বুকে বল এল। সে এগিয়ে গিয়ে বললে, আপনারা অভয়কে খুঁজতে বেরিয়েছেন ত'?

পূর্ণবাবু তার দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন।

বিনোদ বললে,—সে এই গলি দিয়ে পালিয়েছে। আসুন আমার সঙ্গে। খুব জোরে ছুটলে এখনো তাকে ধরতে পারবেন। আমি তাকে জাপটে ধরেও রাখতে পারলুম না। খুব যুযুৎসুর প্যাঁচ শিখেছে যা হোক! আপনারা কেউ ও-দিক্ দিয়ে ঘুরে যান,—আমি এ-দিকে যাচ্ছি। ঐখানে কোথাও লুকিয়ে আছে নিশ্চয়।

পূর্ণবাবু হঠাৎ তাকে বুকে জড়িয়ে শিশুর মত ভেউ-ভেউ করে' কেঁদে উঠলেন, বললেন,—কৈ তোমার অভয়? ঐ দেখ—বলে' চারজনের কাঁধে উত্তোলিত একটা খাটিয়ার পানে ইঙ্গিত করলেন।

বিনোদ কিছু বুঝতে পারলে না। খাটিয়ার উপরে লম্বালম্বি কি একটা জিনিষ আগাগোড়া ঢাকা! কে একজন বললে,—আজ বিকেলে মোটর চাপা পড়ে' সে মারা গেছে—

বিনোদ সমস্ত গায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে,—মিথ্যা কথা। সে এতক্ষণ আমার সঙ্গে বসে' গল্প করলে, দুজনে বেড়াতে বেরোলুম—কেন আমায় মিছামিছি ভয় দেখাচ্ছেন? সে বললে,—আপনারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, সে স্পেনে যাচ্ছে; সেখান থেকে জাহাজে করে' আমেরিকায়—কত কথা বললে! আমাকে পয়সা দিতে চাইলে—গরদের পাঞ্জাবির উপরে মেরুণার শাল—আসুন না আমার সঙ্গে এই গলিতে, তাকে বার করে' না দিই ত কী বলেছি—

পূর্ণবাবুরা এগোতে লাগলেন। বিনোদ হতভম্বের মত তেমনি দাঁড়িয়ে আছে! ব্যাপারটা সে স্পষ্ট করে, এখনো বুঝতে পাচ্ছে না। সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে নাকি? না'ত! রসা রোড, রাস্তার এক পারে ইলেকট্রিক ও অন্য পারে গ্যাস জ্বলছে—লাঠি-হাতে ঐ একটা কনষ্টেবল, দূরে ঐ পূর্ণবাবুদের দল চলেছে শ্মশানে।

পূর্ণবাবু হেঁকে বললেন,—তুমি এবার বাড়ী যাও বিনু!

বিনোদ তবু নড়ে না। ভয়ে সে জমে গেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, পূর্ণবাবুরা কালীঘাটের দিকে ঘুরে গেলেই পাশের গলি থেকে অভয় বেরিয়ে

আসবে। অভয় আবার বেরিয়ে আসবে ভাবতে বিনোদ হঠাৎ আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

কিন্তু আবার অমনি সেই খিল্‌খিল্‌ হাসি! একেবারে তার কাছে—রাস্তার উপরে। কিন্তু অভয় কোথাও নেই! একটা ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে মাত্র।

ট্যাক্সিটা বিনোদ দাঁড় করালো। বাড়ি থেকে অনেক দূরে সে চলে' এসেছিলো, এখন পায়ে হেঁটে কিছুতেই সে যেতে পারবে না। পেছন থেকে অভয় এসে তার সঙ্গ নেবে; তার কাঁধে হাত রেখে গল্প করতে চাইবে, সাত আনা সে ধেরেছিলো, এখনো সে ভোলেনি!

ট্যাক্সি চেপে বিনোদ বললে,—চালাও এলেনবি রোড।

কিন্তু কিছুদূর থেকেই মনে হ'ল ট্যাক্সিটার আগে-আগে অভয়ও ছুটে চলেছে। কিছুতেই সে বিনোদকে ছেড়ে দেবে না। বিনোদ চেঁচিয়ে উঠলো,—খুব জোরে চালাও পাঁয়জি।

শিখ ড্রাইভার গাড়ি খুব জোরে ছুটিয়েছে। অভয় ট্যাক্সির সঙ্গে সমানে চল্‌তে পার্‌ছে না। হাত তুলে স্পষ্ট সে বললে,—আস্তে। কিন্তু ট্যাক্সি থাম্‌ল না, তার গায়ের উপর হুড়মুড় করে পড়ল। বেচারা অভয় দলা পাকিয়ে চাকার তলায় চেপ্‌টে গেল!

বিনোদ চোখ বন্ধ করে' কর্কশ গলায় চীৎকার করে' উঠ্‌ল,—গেল, গেল,—বাঁধো গাড়ি, বাঁধো শীগ্‌গির বলছি।

ড্রাইভার কিছু বুঝতে না পেরে গাড়ি থামিয়ে বললে,—ক্যা হুয়া?

বিনোদ ঝুঁকে পড়ে গাড়ির তলাটা দেখতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য্য কোথাও একবিন্দু রক্ত নেই!

অভয় তাড়াতাড়ি উঠে এসে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে,—ভয় কি, আমার কিছুই হয়নি! খালি এই মেরুদণ্ডটায় সামান্য একটু চোট লেগেছে। খুব হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলি যা হোক! আচ্ছা, গুডনাইট!

আর তাকে দেখা গেল না।

খুড়া মহাশয়

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শরতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। বড়ঘরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া গগন চক্রবর্ত্তী তামাক খাইতেছেন। ঘরের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটি পীড়িত, এখনি ডাক্তার আসিবার কথা আছে।

ইঁহারা দুই ভাই, নবীন ও গগন। গ্রামটি নৈহাটির নিকটে চন্দ্রদেবপুর। ইঁহারা এখানকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কিন্তু শুনা যায় নাকি বৃদ্ধ নবীনের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা আছে। কেহ বলে, ইহা বাজে গুজব; কেহ বলে, ইহা সত্য কথা; কিন্তু কেহই সে-টাকা স্বচক্ষে দেখে নাই। সে-টাকা যে লোহার সিন্দুকটিতে আছে অথবা নাই, সেই সিন্দুকটিমাত্র সকলে দেখিয়াছে। সেটি বৃদ্ধের শয়নকক্ষে অবস্থিত। বৃদ্ধ সর্ব্বদাই সেই ঘরে থাকিয়া সিন্দুকটি আগলাইয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্র নবকুমার পশ্চিমে চাকরি করে, সে অনেকবার পিতাকে স্বীয় কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ কখনও যান নাই। সকলে বলে, তিনি সিন্দুকটি ফেলিয়া যাইতে পারেন না।

গগন চক্রবর্ত্তী বসিয়া বসিয়া নীরবে তামাক খাইতে লাগিলেন। ক্রমে ডাক্তার-বাবুর লণ্ঠনের আলো উঠানে পড়িল। ডাক্তারবাবু আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"চক্রবর্ত্তী মশাই! খবর কি?"

চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি নামাইয়া বলিলেন—"ডাক্তারবাবু? এস, খবর ভাল। এখনও বেহুঁস রয়েছেন—বড্ড জ্বরটা রয়েছে কি না! কিন্তু নাড়ী বেশ চল্‌ছে এখনও! উঠে এসে—একবার দেখ না।"

ডাক্তারবাবু উঠিয়া আসিলেন। চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া, দ্বার খুলিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পিলসুজের উপর একটি মাটির প্রদীপ ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল। একখানি লম্বা ও চওড়া তক্তপোষের উপর মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধ রোগী নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার পুত্রবধূ সাবিত্রী পায়ে হাত বুলাইতেছে।

ইঁহাদের প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাবিত্রী ঘোমটা টানিয়া দিল। গগন চক্রবর্ত্তী প্রদীপটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। ডাক্তার বৃদ্ধের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, —থার্মোমিটার দিয়া উষ্ণতা লইলেন। পরীক্ষান্তে বলিলেন—"এখনও খুব জ্বর। সে ফিবার-মিক্‌শ্চারটা খাওয়ান হচ্ছে?"

সাবিত্রী ঘোমটাবৃত মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল—হইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন—"আজ সারারাত্রি ওটা দেওয়া হোক্। ভোরের দিকে রিমিশন্ হবার সম্ভাবনা।"

বলিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিলেন। গগনচন্দ্রও তাঁহার সহিত দরজা অবধি যাইলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবুকে খবর দিয়েছেন?"

"নাঃ, দিইনি! কিছু ভাবনা নেই, দাদা ভাল হয়ে উঠবেন। ওরকম ত হয়ই ওঁর মাঝে মাঝে। নবুকে খবর দিলেই এখনই খরচপত্র করে বাড়ী আসবে তাই খবর দিইনি।"

ডাক্তারবাবু বললেন—"গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না কিন্তু। আজ পাঁচ-পাঁচ দিন জ্বরটা ছাড়ল না, ভারি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। জ্বর ছাড়বার সময় সামলাতে পারলে হয়!"

গগন বলিলেন—"আরে, না না। আমি এতকাল দেখছি। কিছু ভয় নেই।"

"দেখা যাক্। অনেক বয়স হয়েছে কিনা, তাই ভয় হয়।" বলিয়া ডাক্তারবাবু মৃদুমন্দ পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারবাবুর কথাই সত্য হইল—ভোরবেলায় প্রাণপাখী বৃদ্ধের দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুই এক মিনিটের জন্য মাত্র তাঁহার চেতনা হইয়াছিল। তখন তিনি শুধু বলিয়াছিলেন—"নবু—নবু এসেছে?"

বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিলে, পাড়ার লোক দুইটি-একটি করিয়া আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই বলিল—"তা বেশ গেছেন, খুব গেছেন। বয়স হয়েছিল—তোমাদের সব রেখে গেছেন,—এ ত ওঁর সৌভাগ্য। তবে নবু কাছে থাকলে ভাল হ'ত।"

সৎকারের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। সেখানে সত্যচরণ নামে একটি যুবক দাঁড়াইয়াছিল—সে নবকুমারের একজন বিশেষ বন্ধু। তাহার হাতটি ধরিয়া গগনচন্দ্র বলিলেন—"তুমি বাবা গিয়ে, নবুকে একখানি টেলিগ্রাম করে দাও; আমার আর হাত পা সরছে না।"

সত্যচরণ বলিল,—"আচ্ছা, আমি আপিস যাবার সময় ষ্টেশন থেকে টেলিগ্রাম করে দেব এখন।" সত্যচরণ কলিকাতায় চাকরি করে—রোজ নয়টার ট্রেণে আপিস যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিনটি শোকের মধ্যে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে সকলে দুগ্ধাদি পান করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিল। গগনচন্দ্র বিপত্নীক। তিনি একা একঘরে শয়ন করিয়াছিলেন। অনেক রাত্রি হইল,—গৃহের কুত্রাপি আর কোন সাড়াশব্দ নাই—কেবল গগনচন্দ্র তাঁহার শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছেন। শোকটা ইঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাগিয়াছে বুঝি? ইহা শোক, না আতঙ্ক?—দুইটি নিকট সম্পর্কীয় বৃদ্ধের মধ্যে একটি মরিলে, অপরটির সহজেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়,—তাহার মনে হয়, এইবার ত আমর পালা আসিল।

যাহা হউক, ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। গগনচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে নিজের ঘরের খিলটি খুলিয়া, নগ্ন-পদে বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জমাট অন্ধকার,—তাহার উপর আকাশে মেঘ করিয়াছে। মাঠের প্রান্তে শৃগাল একটা ডাকিয়া উঠিল। গগনচন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বড়-ঘরের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন। যে ঘরে গতরাত্রে বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে,—সে-ঘরটি আজ তালাবন্ধ। গগনচন্দ্র নিঃশব্দে তালাটা খুলিয়া সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভয়ে তাঁহার বুকটা দুরদুর করিয়া উঠিল। হায় ভ্রাতৃস্নেহ! এত রাত্রে নিদ্রাহীনচক্ষে ভ্রাতা বুঝি ভ্রাতার মৃত্যুশয্যাটি একবার দেখিবার জন্য ও অশ্রুপাত করিবার জন্য আসিয়াছেন!

গগনচন্দ্র পূর্ব্ববৎ সাবধানতার সহিত ঘরের দুয়ারটি প্রথমে বন্ধ করিয়া দিয়া একটি দিয়াশলাই জ্বালিলেন। প্রদীপটি জ্বালিয়া, পূর্ব্বকথিত লোহার সিন্দুকটির নিকট অগ্রসর হইলেন। সিন্দুকটির উপর হইতে একটি ভাঙ্গা কাঠের হাতবাক্স, একখানি ছিন্ন মহাভারত ও কয়েকটি খালি ঔষধের শিশি নামাইয়া, সিন্দুক খুলিয়া ফেলিলেন। কয়েকটি কাপড়ের পুঁটুলি তাহা হইতে নামাইবার পর, নীচের দিক্ হইতে পুরাতন লাল চেলী-বাঁধা একটি ছোট পুঁটুলি বাহির হইল। সেইটি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে তাড়াবন্দী অনেক নোট রহিয়াছে। তাহা দেখিবা-

মাত্র সেই ক্ষীণালোকে সেই মৃত্যুকক্ষে গগনচন্দ্রের মসীকৃষ্ণ মুখমণ্ডলে শুভ্র দন্ত-পংক্তির ছটা ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ত্বরিতহস্তে অন্য পুঁটুলিগুলি যথাস্থানে পুনঃসন্নিবিষ্ট করিয়া গগনচন্দ্র সিন্দুকটি বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাভারত, ভাঙ্গা বাক্স ও ঔষধের শিশিগুলি তাহার উপর পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া রাখিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া, দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া, নিজ শয্যাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুয়ারটি বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া, গগনচন্দ্র শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। বালিশের নিম্নে তাঁহার চশমার খোলটি ছিল। চশমাটি চক্ষে লাগাইয়া নোটের তাড়াগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।—কেবল দশটাকার নোট—একখানিও নম্বরওয়ারি নোট তাহাতে ছিল না। একটি তাড়া খুলিয়া নোটগুলি সাবধানে গণনা করিয়া দেখিলেন,—একশখানি আছে—হাজার টাকা। প্রত্যেক তাড়াটি খুলিয়া একে একে গণনা করিলেন,—প্রত্যেকটিতেই হাজার টাকা করিয়া। এরূপ দশটি তাড়া ছিল—দশ হাজার টাকা!

একবার গণিয়া তৃপ্তি হইল না,—গগনচন্দ্র নোটগুলি বারংবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে ভোর হইয়া পড়িল। তখন তিনি পুঁটুলিটি নিজের সিন্দুকে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া, ঘরের বাহিরে আসিলেন।

দুই-একটা কাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে—অল্প অল্প আলো হইয়াছে! গাড়ুটা হাতে করিয়া বাটীর বাহির হইয়া, আমবাগানের ভিতর দিয়া গগনচন্দ্র পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তখনও কোথাও জনমনুষ্যের দেখা নাই। প্রথমেই গগনচন্দ্র দাদার লোহার সিন্দুকের চাবিটি ছুড়িয়া পুষ্করিণীর মধ্যস্থানে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া গাড়ুতে জল ভরিয়া, ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই দিন বেলা নয়টার সময় প্রবাস হইতে সদ্য-পিতৃহীন নবকুমার বাটী আসিয়া পৌঁছিল। সে ইতিমধ্যেই নিজের সাধারণ বেশ পরিত্যাগ করিয়া, কাচা পরিয়াছে, পদ নগ্ন করিয়া আসিয়াছে।

নবকুমারের বাড়ী পৌঁছিবার সঙ্গে-সঙ্গে আর একবার ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল। তাহা শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সকলে বলিল—"নবু, কেঁদ না বাবা, চুপ কর। বাপ-মা কি আর চিরদিন থাকে? এই তোমার খুড়া মশায় রয়েছেন, ইনিই এখন তোমার বাপ হ'লেন। চুপ কর বাবা!"

প্রতিবেশীরা গৃহত্যাগ করিবার সময় পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল

—"আহা, গগন চক্রবর্ত্তী বুড়োর চেহারাটি কি হয়ে গেছে দেখেছ একদিনে! চোখ-টোক সব একেবারে ব'সে গেছে!"

একজন বলিল—"আহা, ভাইয়ের শোকটা বড্ড লেগেছে বামুনের।"—চক্ষু বসার আসল কারণ যে, সারারাত্রি জাগরণ ও মনের অঙ্গনে শয়তানের তাণ্ডবনৃত্য, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না।

যথাসময়ে নবকুমার খুড়া মহাশয়ের সহিত বসিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিল। ভোজনান্তে গগনচন্দ্র মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন, নবকুমার তাঁহার কাছে বসিয়া ছিল। খুড়া মহাশয় বলিলেন—"শ্রাদ্ধশান্তির ত আয়োজন এইবেলা থেকে করতে হবে! টাকা-কড়ি কিছু এনেছ?"

নবকুমার বলিল—"টাকা-কড়ি আমি কোথায় পাব? বাবার সিন্দুক থেকে কিছু বেরুতে পারে বোধ হয়।"

"তা দেখ—যদি কিছু থাকে।"

"চাবিটা?"

"চাবি? চাবি কোথায়, তা ত বলতে পারিনে। হয় ত বউমাকে দিয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা কর দেখি?"

নবকুমার গিয়া সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—সাবিত্রী বলিল—"আমাকে ত দিয়ে যাননি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কোমরের ঘুন্‌সিতে ছিল দেখেছি। খুড়া মহাশয় হয় ত খুলে নিয়ে থাক্‌বেন।"

"না—উনি ত বল্লেন—চাবি কোথায়, কিছুই জানেন না।"

নবকুমার ফিরিয়া আসিয়া খুড়ামহাশয়কে এই কথা বলিল। তিনি বলিলেন—"তাঁর কোমরে ছিল? তা ত লক্ষ্য করিনি। তবে হয়ত তাঁর চিতায় উঠেছে!"

নবকুমার একটু বিরক্তির সঙ্গে বলিল—"ওটা আপনি লক্ষ্য করলেন না?"

খুড়া মহাশয় হুঁকা নামাইয়া কাঁদকাঁদ স্বরে বলিলেন—"আরে বাবা, সে সময় কি আমার চাবি, সিন্দুক, টাকা-কড়ি ভাববার মত মনের অবস্থা ছিল? সে সব তোমরা পার।"

নবকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল। খুড়া মহাশয় ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে নবকুমার বলিল—"তবে এখন উপায়?"

"উপায় আর কি? কামার ডাকিয়ে সিন্দুক খোলাতে হবে।"

কামার ডাকাইয়া সিন্দুক খোলান হইল। তাহা হইতে কেবল গুটিত্রিশেক নগদ টাকা আর নবকুমারের পরলোকগতা জননীর খানকয়েক সোনারূপার পুরাতন অলঙ্কার বাহির হইল!

ইহা দেখিয়া নবকুমার ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল! তাহারও বরাবর মনে ধারণা ছিল যে, তাহার পিতার সিন্দুকে নগদ দশ হাজার টাকা আছে। তাহার

মনে বিশ্বাস হইল, খুড়া মহাশয়ই সে টাকা সরাইয়াছেন। অথচ তাহার সাক্ষী-সাবুদ কিছুই নাই!

খোলা সিন্দুকের সম্মুখে নবকুমার বসিয়া ভাবিতেছিল, এমন সময় খুড়া-মহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু পেলে?"

সিন্দুক হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, নবকুমার তাহা দেখাইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল,—"দশ হাজার টাকা ছিল যে, কোথা গেল?"

গগনচন্দ্র আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"কত টাকা?"

"দশ হাজার।"

খুড়া মহাশয়ের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"দশ হাজার টাকা! পাগল! কোথা পাবেন তিনি?"

নবকুমার বলিল—"কেন, সকলে বলত, এই সিন্দুকে তাঁর দশ হাজার টাকা আছে।"

"সকলে ত সব জানে। কেন, দাদা ত সর্ব্বদাই বলতেন, তাঁর এক পয়সাও নেই। তুমি পশ্চিম থেকে যা টাকা-কড়ি পাঠাতে মাঝে মাঝে, তাই খরচপত্র করতেন, আর দু-পাঁচ টাকা জমিয়েছিলেন। হ্যাঁ—দশ হাজার টাকা! দশ হাজার টাকা কি সাধারণ কথা রে বাবা!"

নবকুমার আর কি করিবে! নীরবে মনের সন্দেহ ও রাগ হজম করিয়া, যথা-সময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। অল্পদিন পরেই তাহার ছুটি ফুরাইল,—ভগ্নহৃদয় লইয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এতদিন তাহার পিতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য স্ত্রীকে বাটীতে রাখিয়াছিল। এবার সাবিত্রীকে সে পশ্চিমে লইয়া যাইয়া নিজের কাছে রাখিবে। স্ত্রীকে বলিয়া গেল—পূজার ছুটি হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই; ইতিমধ্যে একটি বাড়ী ঠিক করিয়া, পূজার সময় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নবকুমার কলিকাতায় আসিল। পুরাতন গহনাগুলি বিক্রয় করিবে, কিছু কাপড়-চোপড়ও কিনিবার প্রয়োজন আছে। সারাদিন বউবাজারে ও বড়বাজারে ঘুরিয়া, আড়াইশত টাকায় গহনাগুলি বিক্রয় করিল। বড়বাজারে একটা কাপড়ের দোকানে বসিয়া কিছু কাপড় খরিদ করিল। তাহার পকেটবুকে নোট ছিল, টাকা দিবার জন্য পকেটবুক বাহির করিতে যাইয়া দেখে, পকেটবুক নাই—গাঁটকাটায় কখন চুরি করিয়াছে, জানিতে পারে নাই!

বিপদের উপর বিপদ! সেই পকেটবুকে তাহার রিটার্ণ টিকিটখানি পর্য্যন্ত ছিল, আড়াইশত টাকার নোট ছিল—খানকতক পুরাতন চিঠিপত্র ছিল।

দোকানের কাপড় দোকানে রাখিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল। আজ

পাঞ্জাব-মেলে সে কর্ম্মস্থানে ফিরিবে ভাবিয়াছিল, এমন টাকা নাই যে নূতন টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া যায়।

ভাবিল, পরদিন সত্যচরণ আসিলে, আপিসে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু টাকা ধার লইয়া যাইবে। দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া কোন রকমে নবকুমার বাসায় রাত্রি-যাপন করিল।

প্রভাতে তখনও নবকুমার শয্যাত্যাগ করে নাই, বাসার একটি মোটা বাবু একখানি সংবাদপত্র হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন—"নবকুমারবাবু, দেখুন, ঈশ্বর যা করেন, তা ভালর জন্যই করেন। কাল যে আপনার পকেটবুক চুরি হয়েছিল, সেটা একটা খুব মঙ্গল বলতে হবে!"

নবকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কেন, ব্যাপারটা কি?"

স্থূল-কলেবর যুবকটি সংবাদপত্র হইতে পাঠ করিলেন—"গতরাত্রে পাঞ্জাবমেল আসানসোলের নিকট পৌঁছিলে একটা মালগাড়ীর সঙ্গে ভীষণ কলিশন্ হইয়া যায়। দুই-তিনখানি যাত্রীগাড়ী চূর্ণ হইয়াছে। ড্রাইভার অত্যন্ত আহত হইয়া হাসপাতালে আছে। যাত্রিগণের মধ্যে ছয়জন মৃত ও বাইশজন সাংঘাতিক রকম আহত। মৃতের তালিকা—"

মৃতের তালিকার মধ্যে "নবকুমার চক্রবর্ত্তী"র নামও পাওয়া গেল।

স্থূল-বাবুটি বলিলেন—"কি রকম? আপনিও মরেছেন না কি?"

নবকুমার বলিল—"বোধ হয়, আমার নামের অন্য কেউ?"

যুবকটি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি নবকুমারের ভূত ন'ন ত? কি জানি মশাই, বিশ্বাস নেই।"—বলিয়া বাবুটি চলিয়া গেলেন।

এ-কথা শুনিয়া নবকুমারের মস্তিষ্কে দু' একটা কথার উদয় হইল। সে সকাল-সকাল আহার সারিয়া, সত্যচরণের নিকট টাকা ধার করিয়া আসানসোলে চলিয়া গেল।

সেখানে গিয়া পুলিশ আপিসে সন্ধান লইল। জিজ্ঞাসা করিল—"একজন নবকুমার চক্রবর্ত্তী ব'লে যে মরেছে—আপনারা তাঁর নাম জানলেন কি ক'রে?"

দারোগা বলিল—"তার পকেটবুকটি বেরিয়েছে।"

নবকুমার দেখিল, তাহারই পকেটবুক—তাহাতে তাহার নোট, চিঠি, রিটার্ণ-টিকিট, সবই রহিয়াছে! যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই—সেই গাঁটকাটাই তবে মারা পড়িয়াছে! পাপের এরূপ হাতে হাতে প্রতিফল আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে?"

"আমি নবকুমারের একজন বন্ধু।"

"লাসের কি হবে? অ্যাক্সিডেণ্টের পর আমরা খবরের কাগজে টেলিগ্রাফ করেছি। লাসের আত্মীয়েরা এসে কেউ জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে ত করবে, নইলে আমরা পুঁতে ফেল্‌ব।"

নবকুমার একবার ভাবিল—"পুঁতিয়াই ফেলুক। তাহার মস্তকে এই সময়ে একটা মৎলব পাকা হইয়া আসিতেছিল। ভাবিল, যদি সংবাদ পাইয়া খুড়া মহাশয় আসেন, ত লাস দেখিয়াই জানিতে পারিবেন, আমি নহি।'

দারোগার নিকট লাস জ্বালাইবার অনুমতি চাহিল। দারোগা বলিল—"আর এ টাকা-কড়ি? লাসের ওয়ারিশান্ কে?"

"লাসের এক স্ত্রী আছে, খুড়া আছে। স্ত্রী ওয়ারিশ। খুড়াকে খবর দিলে আসিয়া টাকা লইয়া যাইবে।"

দারোগা খুড়ার ঠিকানা নোট করিয়া লইল। লাস জ্বালাইয়া নবকুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। স্থূল-বাবুটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মশাই? খবর কি?"

নবকুমার গভীরভাবে বলিল—"গিয়ে দেখলাম,—আমি নই,—আর একজনই মরেছে বটে!"

বাবুটি বলিলেন—"তবু ভাল।"

পরদিন সত্যচরণের আপিসে গিয়া নবকুমার তাহার সঙ্গে দেখা করিল। শুনিল, যদিও পল্লীগ্রামে দৈনিক কাগজ যায় না, তথাপি লোকমুখে বাটীর লোক তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছে। সত্যচরণের সঙ্গে অনেকক্ষণ গোপন-পরামর্শ করিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাকাল, গগনচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। পাড়ার দুই-চারিজন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গতকল্য নবকুমারের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের শ্রাদ্ধ যেমন ঘটা করিয়া হয়, যুবকের শ্রাদ্ধ সেরূপ হয় না। গগনচন্দ্র আসানসোল হইতে নবকুমারের যে আড়াইশত টাকার নোট আনিয়াছিলেন,—তাহারই মধ্য হইতে কেবল পঞ্চাশটি টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। বাকী দুই শত টাকা নবকুমারের বিধবাকে দিয়াছেন।

সাবিত্রী যখন সধবা ছিল, তখন সর্ব্বত্র তাহার যে একটা সুনাম ছিল—সম্প্রতি তাহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। যেদিন স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ আসে, সেই দিনমাত্র সে অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিয়াছিল। রাত্রে সত্যচরণের স্ত্রী আসিয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। পরদিন হইতে সে মুখখানি বিমর্ষ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সদ্যোবিধবার যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার কিছুই দেখা যায় না। প্রায় রোজই দ্বিপ্রহরে সত্যচরণের স্ত্রীর কাছে যায়। এ অবস্থায় এরূপ করিয়া পাড়া-বেড়ানো কি তাহার উচিত? এরূপ অস্বাভাবিক বালবিধবা ত হিন্দুগৃহে দেখা যায় না!

সমবেত বৃদ্ধগণের মধ্যে হুঁকাটি নিয়মিতরূপে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

এ সভাটি অদ্য প্রায় নীরব, কেবল মাঝে মাঝে কেহ বলিয়া উঠিতেছেন—"সংসার অনিত্য, সকলই মায়া!" কেহ কেহ বলিতেছেন,—"আহা, নবকুমার বড় ভাল ছেলে ছিল;—আজকালকার দিনে ওরকম প্রায় দেখা যায় না।"

একটু পরে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। মুহূর্ত্ত পরে বাড়ীর চাকর চিনিবাস হাঁপাইতে হাঁপাইতে গলদঘর্ম্ম হইয়া, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শুধু দুইবার বলিল—"কর্ত্তা—কর্ত্তা!" তাহার মুখে আর কোন বাক্যনিঃসরণ হইল না—লোকটা সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া, প্রচলিত উপায়ে তাহার মুখে জল দিয়া, তাহাকে পাখা করিয়া, ক্রমে তাহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। ক্রমে লোকটা সুস্থ হইতে লাগিল। সকলে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে চিনিবাস, অমন করলি কেন?"

চিনিবাস তখন ভয়ে শিহরিয়া বলিল—"রাম রাম রাম! ভূত গো কর্ত্তা।"

উহার মধ্যে যে বৃদ্ধ বাল্যকালে কিঞ্চিৎ ইংরাজী পড়িয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—"দূর বেটা চাষা—ভূত কি! ভূত আছে না কি?"

চিনিবাস চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—"ভূত নাই? ঐ পুকুরধারে বাঁশতলায় দেখ গে ঠাকুর!"

অনেক প্রশ্নাদির পর ক্রমে ক্রমে চিনিবাস বলিল, কিছু পূর্ব্বে যখন সে পুকুরে বাসন মাজিয়া ফিরিতেছিল, তখন সেই পুকুরের ঈশানকোণে বাঁশঝাড়ের তলায় অন্ধকারে দেখিল—আপাদমস্তক শাদা কাপড়ে ঢাকা একটা-কি বেড়াইতেছে! নিকটকবর্ত্তী হইবামাত্র পদার্থটা কাছে আসিল। ঠিক নবকুমারের মত চেহারা—আর বলিল—"ওঁরে চিঁনে—এঁকবার খুঁড়ো মশায়কেঁ ডেঁকে দিঁতে পাঁরিস?" তাহা শুনিবামাত্র চিনিবাস সমস্ত বাসন ও পাথরবাটি সেখানে আছাড়িয়া ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

ইহা শুনিয়াই খুড়া মহাশয় রামনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; বলিলেন—"ঠিক দেখেছিস্?"

"ঠিক না ত কি বেঠিক দেখেছি কর্ত্তা? ওরে বাবা রে! আর আমি সন্ধ্যাবেলায় বাসন মাজতে যাব না।"

পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক-প্রকৃতির বৃদ্ধটি বলিলেন—"চক্রবর্ত্তী মশায়, এ কথা আপনি বিশ্বাস করছেন? বেটা অসাবধানে বাসনগুলো ভেঙে ফেলেছে, তাই এসে ঐ কথাটা ওজর করছে।"—কিন্তু বক্তার হৃদয়ের ভিতরটা গোপনে দুর্‌দুর্‌ করিতে লাগিল।

সে-সন্ধ্যা ত কাটিল। তাহার পর, তিন-চারি দিন ধরিয়া পাড়ার ভদ্রলোকেরা আসিয়া গগন চক্রবর্ত্তীর নিকট সংবাদ দিলেন, কেহ দীঘির ধারে, কেহ ভাঙ্গা শিব-মন্দিরের নিকটে, কেহ অন্য কোথাও 'নবকুমার'কে দেখিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত

নাস্তিক-বৃদ্ধটিকে আর সন্ধ্যার পর বাহির হইতে দেখা যায় না। অন্যান্য বৃদ্ধেরা গগন চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"শাস্ত্র ত মিথ্যে হবার নয়! অপঘাতে-মৃত্যুটা হ'ল কিনা,—ও-রকম ত হবারই কথা! বছরটা পুরুক, গয়ায় গিয়ে প্রেতশিলায় একটা পিণ্ডি দিয়েই দিন, উদ্ধার হয়ে যাবেন।"

একদিন সন্ধ্যার পর খুড়া মহাশয় পুষ্করিণীর তীর হইতে মুখ ধুইয়া, জলভরা গাড়ুটি হাতে করিয়া আমবাগানের ভিতর দিয়া ফিরিতেছিলেন। সহসা এক শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখটি ছাড়া সমস্ত গাত্র বস্ত্রে আবৃত ছিল। আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র সে বলিল—"খুঁড়ো মশায়,—সেঁ দশ হাঁজার টাঁকা—"

আর শুনিবার পূর্ব্বেই খুড়া মহাশয় সেইখানে গাড়ু আছাড়িয়া ফেলিয়া "রাম রাম" শব্দ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইলেন।

পরদিন অমাবস্যা,—সন্ধ্যার পর খুড়া মহাশয় আর বাটীর বাহির হইলেন না। রাত্রি নয়টার সময় আহার করিয়া শয়ন করিলেন। যখন তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন—রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময়, গাত্রে কাহার শীতল হস্তস্পর্শে খুড়া মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। খুড়া মহাশয় চম্‌কিয়া ঘুমের ঘোরে বলিলেন—"কে—ও?"

অন্ধকারের মধ্য হইতে শব্দ হইল—"আমি নঁবকুমার।"

শুনিবামাত্র খুড়া মহাশয়ের ঘুমের ঘোর চট্‌ করিয়া ছাড়িয়া গেল।

ভূত বলিল—"সেঁ দঁশ হাঁজার টাঁকা আঁমার বঁউকে যঁতদিন না দিঁচ্চ, তঁতদিন রোঁজ আঁস্‌ব।"

বলিয়া নবকুমার চুপ করিল। খুড়া মহাশয়ের নিঃশ্বাস তখন ঘন ঘন বহিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দাঁত ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। নবকুমার তখন মেঝের উপর হইতে বরফ-বাঁধা পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া, খোলা জানালার কাছে গিয়া একটি গরাদে সরাইয়া, বাহির হইল। বাহিরে কিয়ন্দূরে সত্যচরণ অপেক্ষা করিতেছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যচরণ আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবকুমারকে সংবাদ দিল—খুড়া মহাশয় তাহার ট্রেণেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন,—সাবিত্রীর নামে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া আনিয়াছেন। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"এ টাকা কোথা থেকে এল?" গগনচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"টাকাটা ছিল আমার দাদার। সকলে যে বল্‌ত, তাঁর দশ হাজার টাকা আছে—তা দেখছি মিথ্যা নয়। কিন্তু তাঁর লোহার সিন্দুক থেকে বেরোয় নি। কালকে রাত্রে হঠাৎ তাঁর একটা পুরনো টিনের বাক্স খুলে দেখি, এক টুকরো লাল চেলিতে

মোড়া দশ হাজার টাকার নোট্! দেখে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হ'ল আর কি! আহা, আজ যদি নবু বেঁচে থাকত! পিতৃধন! যা হোক, বিধবাটার উপায় হ'ল!"

ইহার পর নবকুমার কলিকাতায় গিয়া, খুড়া মহাশয়কে এক চিঠি লিখিল। লিখিল—সে শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছে যে, তাহার মৃত্যুর একটা গুজব উঠিয়াছে এবং শ্রাদ্ধশান্তিও হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক সে বাঁচিয়া আছে এবং একটু কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিল। অমুক তারিখে সে বাড়ী আসিবে এবং একদিন থাকিয়া স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিম-যাত্রা করিবে।

নবকুমার বাটী আসিয়া শুনিল, খুড়া মহাশয় কি-একটা জরুরি কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছেন। স্ত্রীকে লইয়া সে পশ্চিম চলিয়া গেল।

গল্পের শেষে

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

বর্ষাকাল, সুতরাং বৃষ্টি ত' হবেই। কিন্তু সারাদিন সমানে জল পড়বার পর রাত্তিরেও তার এমন বিরাম হবে না জানলে, আমরা বোধ হয় সেই কলকাতা ছেড়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে ফুটবল খেলার লোভে আসতাম না।

জায়গাটা যে এমন পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ, তাই-বা কে জানত! খবরের কাগজে নসীপুরের নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের নাম দেখে ভবেশ একটা এণ্ট্রি করে দিয়েছিল। ভবেশ আমাদের দি আন্‌বীট্‌ন্‌ ইলেভেনের অত্যন্ত উৎসাহী কর্ম্মঠ সেক্রেটারী। খেলাটা ফুটবল এবং এণ্ট্রি-ফি আট আনার নীচে থাকলে সে চোখ বুজে একটা চিঠি ছেড়ে দেবেই—তা সে-খেলা যেখানেই হোক না কেন! আন্‌বীট্‌ন্‌ ইলেভেন্‌ তার ছ'মাসের পরমায়ুতে এ পর্য্যন্ত কাউকে পরাস্ত করতে পারেনি, সেদিক দিয়ে আমাদের রেকর্ড আনবীট্‌ন্‌ সত্যিই। চাঁদা দেওয়া ও একবার করে মাঠে নামাই সার। কিন্তু ভবেশের উৎসাহ তাতে দমবার নয়।

গোড়ার দিকে কলকাতার একটু-আধটু নামকরা 'শিল্ড' বা 'কাপে'ই নামতে গিয়ে আমাদের একটু অসুবিধা হয়েছে, এ কথা স্বীকার করা ভালো। দর্শকেরা আমাদের খেলায় উৎসাহিত হয়ে এমন হাততালি দিতে সুরু করেছে যে, খেলা শেষ হয়ে গেলেও তা থামেনি, অনেকে হাততালি দিতে দিতে আমাদের পেছনে বাড়ি পর্য্যন্ত এসেছে, এ আমার নিজের চক্ষে দেখা। আমরা হেরে গেলেও খুব খারাপ খেলি না। কিন্তু ভাল খেললেও এতটা আমাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক বরদাস্ত

করতে পারছিলাম না। শেষের দিকে তাই কলকাতা ছাড়িয়ে মফস্বলের শহর এবং মফস্বলের শহর ছাড়িয়ে পাড়াগাঁয়ের দিকে আমাদের ঝোঁক একটু বেশী হয়েছে।

কিন্তু পাড়াগাঁয়েরও একটা সীমা আছে—নসীপুর তার বাইরে। নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের কর্ম্মকর্ত্তারা আমাদের চাঁদা পেয়ে খুশী হয়ে জানিয়েছিলেন যে, ষ্টেশন থেকে এক-পা গেলেই তাঁদের ক্লাব বা খেলার মাঠ। আমাদের কোন কষ্টই হবে না। ষ্টেশনে তাঁরা লোকও রাখবেন। 'লোক' বলতে ষ্টেশন-মাষ্টার ও 'এক-পা' বলতে ঘটোৎকচের পা, সেটুকু তাঁরা উহ্য রেখেছিলেন।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভেতর তিনটে-নাগাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেণে গিয়ে যখন নসীপুরে নামলাম, তখন প্রথমে ত মনে হ'ল, গাড়ি বোধ হয় সিগন্যাল না পেয়ে মাঠের মাঝে থামাতে আমরা ভুল করে নেবে পড়েছি। এ আবার ষ্টেশন নাকি! প্ল্যাটফর্ম্ম না থাক, মাটিতে খানিকটা লাল কাঁকরও ত বিছানো থাকে।

হুড়মুড় করে আবার ট্রেণে উঠে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় উদয় খুব পর্য্যবেক্ষণ করে বল্লে—"না রে, ষ্টেশনই বটে, দেখছিস্ না দু'-একটা কাঁকর পড়ে রয়েছে! বাকী সব জলে ধুয়ে গেছে!"

কাঁকর দেখে আশ্বস্ত হয়ে সামনে চাইলাম। বৃষ্টির ভেতর দূরে যেন একটা ভাঙা গাছও দেখা গেল। গাছ নয়, সেটা ষ্টেশনের নাম-লেখা সাইন-পোষ্ট। বৃষ্টিতে নীচের মাটি আলগা হয়ে একটু হেলে পড়েছে। সাইন-পোষ্টের পর দূরে একটা ঘর এবং তার ভেতরে একজন ষ্টেশন-মাষ্টার টিকিট-কালেক্টরকেও পাওয়া গেল। তাঁর হাতে রিটার্ণ টিকিটের অর্দ্ধেক দিয়ে রাস্তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি একটা কাটা খাল দেখিয়ে দিলেন মনে হ'ল।

"ওটা যে খাল মশাই, যাব কি করে নৌকা না হলে?"

ষ্টেশন-মাষ্টার বুঝিয়ে দিলেন—খাল নয়, ওটাই রাস্তা, বৃষ্টিতে ওই অবস্থা হয়েছে। শুনলাম, সেই রাস্তা সাঁৎরে ও কাদা ঠেলে ক্রোশ দু'-এক গেলে নসীপুর গ্রাম পাওয়া যাবে, যদি না বন্যায় সেটা ভেসে গিয়ে থাকে।

দলের অধিকাংশ লোক তৎক্ষণাৎ সেইখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল দেখা গেল, কিন্তু ভবেশ ছাড়বার পাত্র নয়। নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডটা না নিয়ে যেন সে এখান থেকে বাড়ি ফিরবে না! কোনমতেই সকলকে বোঝাতে না পেরে সে চরম যুক্তি প্রয়োগ করলে। বাড়ি ত ফিরবে, কিন্তু যাবে কি হেঁটে? সত্যিই ত! খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রাত্তির আটটার আগে কোন ট্রেণ এই মাঠে আর থামছে না। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে আমাদের ভবেশের কথাতেই রাজি হ'তে হ'ল।

নসীপুরে কেমন করে পেঁছোলাম ও সেখানে জলে জলময় মাঠে ওয়াটার-পোলো ও রাগ্‌বির মাঝামাঝি কি-ধরনের ফুটবল খেলা হ'ল, তার আর বর্ণনায় কাজ নেই। নসীপুর আগমনের এই ভূমিকাটুকু সেরে আসল কথায় এবার নামা যাক্।

এগারজন মিলে খেলতে এসেছিলাম। খেলা-ধূলার নয়, খেলা কাদার পর,

নসীপুর গ্রামের অবস্থা ও শিল্ডের কর্ম্মকর্ত্তাদের আতিথেয়তার নমুনা দেখে ছ'জন কিছুতেই আর থাকতে রাজী হ'ল না। বৃষ্টির ভেতর খাল বা রাস্তা সাঁৎরেই তারা ষ্টেশনে ফিরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ও খেলায় কয়েকটা অতিরিক্ত গোল খেয়ে আমরা একটু বেশী কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এর ভেতর বসন্তর আবার একটু জ্বর-ভাবও দেখা দিয়েছে। জ্বর হওয়াটা আশ্চর্য্য নয়। কারণ ধাক্কাটা তার ওপর দিয়েই একটু বেশী গেছে। সেই ছিল গোল-কীপার! জ্বর অবস্থায় বসন্তকে এই জলের ভেতর ত যেতে দেওয়া যায় না! বসন্তর সঙ্গে ভবেশ, আমি, উদয় ও সুরেন—এই চারজন রাতটার মত নসীপুরেই কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম।

ঠিক ত করলাম, কিন্তু থাক্‌ব কোথায়? নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের কর্ত্তা নগেনবাবু স্বয়ং আমাদের নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করলেন। নগেন্দ্র মেমোরিয়ালের কর্ত্তা নগেনবাবু স্বয়ং—শুনে একটু অবাক্ অনেকে হবে সন্দেহ নেই, আমরাও হয়েছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নগেনবাবু নিজের নামটা বেঁচে থাকতে থাকতেই স্মরণীয় করে রেখে যেতে চান। পরে কে কি করবে, বলা ত যায় না! শিল্ড তৈরীর খরচ যখন তিনিই দিয়েছেন, তখন মেমোরিয়ালটা দুদিন আগে থাকতে হলে কার কি বলবার আছে! যাই হোক, নগেনবাবু আমাদের নিয়ে একটু-আধটু ঘোরাফেরা করেও সুবিধেমত একটা থাকবার জায়গা খুঁজে পেলেন না। তাঁর নিজের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসায় স্থানাভাব। পাড়ার অপর বাড়িতে আতিথেয়তার আদর্শ একটু নীচু বলেই মনে হল। নসীপুরে আরও একটি পাড়া আছে; কিন্তু তাদের ওখানে শুনলাম, 'ব্রজমোহন কাপ' বলে আর একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলা হয়। নগেন্দ্র মেমোরিয়ালের সঙ্গে তাদের আদা এবং কাঁচকলার মত মধুর সম্পর্ক। এখানকার খেলুড়েদের তারা স্থান কিছুতেই দেবে না।

আশ্রয় পাওয়া সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, এমন সময় উদয়ের বুদ্ধিতে একটা সুরাহা হয়ে গেল। গ্রামের একটিমাত্র চলন-সই রাস্তায় বার-কয়েক আসা-যাওয়া করতে গিয়ে একটিমাত্র পাকা দোতলা বাড়ি সকলেরই চোখে পড়েছে! একটু ভগ্নদশা! কিন্তু আমাদের দশা ত তার চেয়েও খারাপ!

উদয় হঠাৎ বলে ফেল্লে—"এ বাড়িটার খোঁজ ত করেননি মশাই! ওদেরও একটা শিল্ড বা কাপ আছে নাকি?"

নগেনবাবু হন্ হন্ করে হাঁটতে হাঁটতে বল্লেন—"না, না মশাই, ও-বাড়ির দিকে তাকাবেন না!"

তাঁকে একরকম জোর করে থামিয়ে বল্লাম—"কেন মশাই, দোষটা কিসের! একজন বিদেশী লোক জ্বরে পড়েছে শুনলেও এই বৃষ্টি-বাদলার রাতে আশ্রয় দেবে না এমন চামার কেউ আছে নাকি!"

নগেনবাবু একটু রেগেই বল্লেন—"আরে না মশাই! গ্রেট বেঙ্গল স্পোর্টিং

বারো গোল খেয়েছিল; তাদেরই ওখানে থাকতে দিইনি, আপনারা ত মোটে আট গোল!"

সামান্য চারটে গোলের তফাতের দরুণ এমন আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে, এ বড় অন্যায় কথা। সুরেন একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বল্লে,—"একটু চেষ্টা করলে আর চারটে গোল কি আমরাই খেতে পারতাম না!"

"আরে না মশাই, সে-কথা নয়! চলুন, চলুন।"

কিন্তু আমরা অমন বাড়ির লোভ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নই কিছুতেই। একবার জিজ্ঞেস করলে দোষ কি, এই আমাদের বক্তব্য।

নগেনবাবু চটে উঠে বল্লেন, "কাকে জিজ্ঞেস করবেন মশাই? ও-বাড়িতে কেউ থাকে?"

"থাকে না! তাহলে ত আরো ভালো! একটা দরজা খোলা পেলেই হবে। নেহাৎ তালা ভাঙতেই হয়, ত দামটা না হয় দিয়েই দেব।"

নগেনবাবু আমাদের বিমূঢ় করে দিয়ে বল্লেন—"তালা নেই মশাই, দরজা সব খোলা!"

"দরজা খোলা, বাড়িতে কেউ নেই, তবু এই বৃষ্টির ভেতর আমাদের ঘুরিয়ে মারছেন!"

"ঘুরিয়ে মারছি না, আপনাদের মারবার ইচ্ছে নেই বলেই ত ঘোরাচ্ছি!"

উদয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের চেয়ে একটু চট্ করে খোলে। সে-ই প্রথম ব্যাপারটা আন্দাজ করে বল্লে,—"ভূতুড়ে বাড়ি নাকি মশাই?"

নগেনবাবু মুখে কিছু না বলে একটু শিউরে উঠলেন।

ভবেশ হেসে উঠে বল্লে,—"এতক্ষণ বলতে হয়! ভূত পেলে কি এদেশে মানুষের আশ্রয় খুঁজি?"

নগেনবাবু গম্ভীর হয়ে উঠলেন অত্যন্ত—"ও-বাড়িতে থাকা হাসির কথা নয় মশাই!"

আমি বল্লাম—"বাড়ির বাইরে থাকাও বিশেষ হাসির ব্যাপার মনে হচ্ছে না! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমরা ওখানেই চল্লাম। শুধু একটা হ্যারিকেন, কটা মাদুর ও একজোড়া তাস যদি জোগাড় করে দিতে পারেন!"

নগেনবাবু তার পরেও আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। অগত্যা অত্যন্ত হতাশ ও করুণভাবে আমাদের শেষ বিদায় দিয়ে ভবেশকে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। এ ভূতুড়ে বাড়িতে রাত্তিরবেলা জিনিষপত্র পেঁছে দিতে আসতেও তিনি নারাজ!

বসন্তকে চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে নিয়ে আমরা ভূতুড়ে বাড়ির দেউড়ির নীচে ভবেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঝুপ্ ঝুপ্ করে সমানে বৃষ্টি পড়ছে!

"মাকড়সার জাল সর্ব্বত্র" মেজেটা স্যাঁতসেঁতে" কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকে নি।

খাটের উপর উঠে বসে হাকলাম ' কে ? কে ওখানে ?

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে পাড়াগাঁয়ের পথে একটা আলোর রেখা দূরে থাক, একটা জোনাকিরও দেখা নেই।

অনেক দিন বিনা ব্যবহারে পড়ে থাকার দরুণ বাড়িটা থেকে কেমন এক ভ্যাপ্‌সা গন্ধ দেউড়ির তলাতেই পাচ্ছিলাম! গাঁয়ের লোক বাড়িটা দেখে যে ভয় পায়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বাড়িটা একেবারে গ্রামের এক টেরে। ধারে-কাছে একটা বসতি নেই। দিনেরবেলা বাড়ির যে চেহারা দেখে গেছি, তা একটু অদ্ভুত। দোতালার একদিকের ঘরের জন্যে দেয়াল তোলার পর ছাদ আর সম্পূর্ণ হয়নি। ছাদহীন দেয়ালগুলো দরজা-জানালার শূন্য ফোকর নিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে বাড়িটার চেহারা সত্যিই কেমন যেন বদলে গেছে! বৃষ্টিতে অন্ধকারে বাড়িটাকে এখন অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু কেমন একটা চাপা অস্বস্তির আবহাওয়া টের পাচ্ছিলাম!

ভবেশ একটা চাকরের মাথায় কিছু বিছানা চাপিয়ে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে খানিক বাদে এসে হাজির হতে সত্যি খুশীই হলাম। চাকরটা আমাদের জিনিষপত্র দেউড়ির কাছে নামিয়ে দিয়েই যেভাবে পড়ি কি মরি করে দৌড় দিল, তা একটা দেখবার জিনিষ।

নিজেরাই বিছানাপত্র ও লণ্ঠন নিয়ে এবার ভেতরের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠলাম। দোতালার একদিকে গুটিকয়েক ঘর ঠিক আছে। সিঁড়ির সামনের প্রথম ঘরটিই বেশ বড়।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা তুলে ধরে ভবেশ অদ্ভুত সুর করে বললে—"কই বাপু ভূত! অতিথি-সজ্জন এল, একটু সাড়া দাও।"

আমরা সকলে তার কথার সুরে শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপারেও হেসে উঠলাম। ভবেশের কথা শেষ হতে না হতেই ওধারের কোন ঘর থেকে লম্বা টানা ক্যাঁ—চ্‌ করে একটা শব্দ হ'ল। ভাঙা পুরাণ কোন জানালার পাল্লা বাতাসে নড়ার শব্দ নিশ্চয়, তবু শব্দটা ঠিক জুতসই ও যথাসময়ে হয়েছে বলতে হবে।

ভবেশ হেসে বল্লে,—"বেশ বেশ! এইত ভদ্রতা, নসীপুর গ্রামে মানুষের চেয়ে ভূত ভালো।"

সঙ্গে সঙ্গে তার কথা সমর্থন করবার জন্যেই যেন পাশের ঘরে ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঝন্‌ঝন্‌ করে একটা আওয়াজ! একটু চম্‌কে উঠলেও সবাই আবার হেসে ফেল্লাম। শুধু বসন্ত জ্বরের রুগী বলেই বোধহয় একটু অপ্রসন্নভাবে বল্লে,—"ঠাট্টা-তামাসা আর ভাল লাগছে না বাপু! বিছানা-টিছানা একটা করতে হয় ত করো।"

সুরেন ও উদয়কে বিছানা পাতবার ভার দিয়ে আমি ও ভবেশ একবার পাশের ঘরে দেখতে গেলাম, ব্যাপারটা কি!

ভবেশ বল্লে—"সাড়া দিচ্ছেন যখন, সশরীরে একবার দেখা দেন কিনা দেখাই যাক না।"

পাশের ঘরটা আকারে ছোট। দেয়াল থেকে নোনা-ধরা চূণ বালি খসে পড়ে ও পুরাণ কাঠ-কাঠরার ভগ্নাংশ থাকার দরুণ অত্যন্ত নোংরা।

ঘরে ঢুকেই দু'জনেই অমন চম্‌কে উঠব ভাবিনি।

বাতিটা ছিল ভবেশের হাতে পেছনে। দরজার গোড়ায় পা দিতে না দিতেই অন্ধকারে কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলার মত ফ্যাঁস করে একটা আওয়াজ শুনে সত্যি শিউরে উঠলাম নিজের অনিচ্ছায়। পেছন থেকে ভবেশও সেটা শুনতে পেয়েছিল, বাতিটা নিয়ে এগিয়ে এসে বল্লে—"শুধু তোমার বাণী নয় বন্ধু, একটু দর্শনও দিও! কই তিনি?"

এবার তাঁকে দেখা গেল চাক্ষুষ। দেখে ভয় পাবারই কথা। অতবড় এবং অমন মিশকালো বেড়াল বাংলা মুলুকে জন্মায় বলে জানা ছিল না। তিনি তাঁর বহু-দিনের দখলি স্বত্বের ওপর আমাদের চড়াও হওয়াটা অন্যায় উপদ্রব মনে করে জ্বল-জ্বলে চোখে গায়ের লোম ফুলিয়ে এখন দন্তবিকাশ করছিলেন।

ভবেশ বাতিটা নামিয়ে হতাশার ভঙ্গিতে বল্লে,—"এটা কি ভালো হ'ল প্রভু! এত আশ্বাস দিয়ে শেষকালে বেড়াল-রূপ ধারণ করলেন! আপনার নিজমূর্ত্তি কই?"

বেড়ালটা আর একবার ফ্যাঁস্ করে উঠল। উত্তরেও আমরা হেসে ফেল্লাম। পেছনের ঘর থেকে বসন্তের বিরক্ত গলা শোনা গেল—"আমার বাতিটা নিয়ে গেলি কোথায়, অন্ধকারেই থাকব নাকি?"

সে-ঘরে ফিরে ভবেশ হেসে বল্লে,—"তোর কি ভয় করছে নাকি! না জ্বরের লক্ষণ!"

বসন্ত আরো যেন বিরক্ত হয়ে বল্লে,—"ভয়-টয় জানি না বাপু! আমার ভাল লাগছে না। খুঁজে খুঁজে আচ্ছা থাকবার জায়গা বার করেছ!"

আমরা সবাই মিলে তাকে অবশ্য ঠাট্টায় নাকাল করে তুললাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল অস্বস্তি একা বসন্তরই হয়নি।

সামনে দীর্ঘ রাত। খাবার-দাবার নগেনবাবু চাকরের সঙ্গে যা পাঠিয়েছিলেন, তার সৎকার করে বসন্তকে একটা বিছানায় শুতে বলে, আমরা আর একটায় তাস খেলতে বসলাম। কেন বলা যায় না, সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে ও ফুটবল খেলে ক্লান্ত হলেও ঘুমোবার জন্যে শুতে কেউ তেমন ব্যাকুল নয় দেখা গেল।

রাত্রের সঙ্গে বৃষ্টির বেগও ক্রমশঃ যেন বাড়তে লাগল! সেইসঙ্গে পুরাণ বাড়ির দরজা-জান্‌লার নানারকম আওয়াজ ক্ষণে ক্ষণে!

তাস খেলাটা তার মাঝে কিছুতেই যেন জমল না। এক সময়ে সবাই তাস

ফেলে দিলাম। সুরেন বল্লে,—"এবার শুয়ে পড়লে হয়!" আমরা সবাই সায় দিলাম, কিন্তু কারুর ওঠবার নাম নেই!

হঠাৎ ভবেশ বল্লে,—"সাধারণ লোক কেন ভয় পায় বুঝেছ ত'? কি রকম আওয়াজটা হচ্ছে শুনছ? কে বলবে যে, ও-ঘরে একটা কাঠের পা ঠক্‌ঠকিয়ে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে না?"

আওয়াজটা আমরা সবাই শুনেছিলাম। এই প্রথম নয়, এর আগেও অনেকবার, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছুই বলিনি।

ভবেশ আবার বল্লে,—"এসব থেকেই মানুষ ভূত তৈরী করে..."

ভবেশের কথা শেষ না হতেই, উদয় বল্লে,—"তা না হয় হোল, কিন্তু অমন আওয়াজটাই বা কিসের? ও ত' আর জানলা নড়ার শব্দ নয়।"

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম একবার। সকলেই একটু যেন হতভম্ব। হঠাৎ সুরেন লণ্ঠনটা নিয়ে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠে পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। কই, কোথাও কিছু নেই ত'!

ভবেশ হেসে উঠল,—"আমাদেরও ভয় ধরল নাকি!" তার হাসিটা খুব আন্তরিক শোনাল না!

উদয় হঠাৎ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে,—"কিন্তু ওটা কি?"

আমাদের সকলের দৃষ্টি তখন সেদিকে পড়েছে! আমি গিয়ে সেটা হাত দিয়ে তুলে ধরলাম,—একটা কালো রঙের খানিকটা ছেঁড়া কাপড়!

হেসে বল্লাম,—"রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে নাকি?"

এবার ভবেশই বল্লে,—"কিন্তু বেড়ালটা কোথায় গেল? ওইখানেই দেখেছিলাম না!"

তাও ত' ঠিক! বেড়ালটাকে ত' এইখানেই দেখা গেছল! এই কাপড়টাকে ভুল করে নি...না, তাও সম্ভব নয়, স্পষ্ট তাকে দেখেছি, রাগের ফোঁসফোঁসানি শুনেছি নিজের কাণে!

তবু হেসে বল্লাম,—"বেড়াল কি তোমার জন্যে এতক্ষণ বসে আছে! সে কখন সরে পড়েছে!"

"কিন্তু কোথা দিয়ে? এ-ঘরের একটিমাত্র জানলা, তাও বন্ধ। ওধারের দরজায় খিল দেওয়া ত' দেখতেই পাচ্ছ!"

বল্লাম,—"আমাদের ঘর দিয়েই পালিয়েছে হয়ত!" মুখে বল্লেও মনের খট্‌কা গেল না। আমাদের ঘর দিয়ে কোন বেড়ালের পক্ষে আমাদের অজান্তে যাওয়া সম্ভব ত' নয়! একেবারে দরজার সামনেই আমরা তাসের আসর পেতে বসে-ছিলাম। একটা ধুম্‌সো মিশকালো বেড়াল পেরিয়ে গেলে জানতে পারব না, এমন বেহুঁস আমরা ছিলাম কি?

ভবেশ বল্লে,—"থাক্‌গে, বেড়ালের অন্তর্ধান-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে আর..."

তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল! আমাদের সকলের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফ-গলানো জলের স্রোত নেমে গেল বিদ্যুৎবেগে!

ওধারের ঘরে বসন্তের সে কি আতঙ্কের চীৎকার! উত্তেজনার মুখে আমরা সবাই তাকে অন্ধকারে একলা ফেলে এসেছি!

ছুটে সবাই এ-ঘরে এলাম। বসন্ত ছাইএর মত মুখ ক'রে উঠে বসেছে! তার কপাল-মুখ অসম্ভব রকম ঘেমে উঠেছে!

"হয়েছে কি? কি হলো?"

বসন্ত হাঁপাবে, না কথা বলবে! অনেক কষ্টে থেমে থেমে যা বল্লে, তার মর্ম্ম এই যে, তার মাথার কাছে বসে কে যেন বরফের মত ঠাণ্ডা নিশ্বাস তার মুখে ফেলছিল!

আমরা সবাই হেসে উঠলাম জোর করে। "জ্বরের ঘোরে তুই দুঃস্বপ্ন দেখেছিস!"

বসন্ত তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বল্লে,—"না, না, আমি জেগে স্পষ্ট সে নিশ্বাস শুনেছি, মুখের ওপর টের পেয়েছি অনেকক্ষণ, তারপর চীৎকার করেছি! তোরা ওরকম করে চলে যাসনি।"

ভবেশ হাসবার চেষ্টা করে বল্লে,—"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। এমন ভয়কাতুরে ছেলেও দেখিনি! আমরা এখানেই শুচ্ছি এবার!"

উদয় একটু ইতস্ততঃ করে বল্লে,—"এক্ষুণি শুয়ে কি দরকার? জেগে একটু গল্প করা যাক্ না!"

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও কারুর সে-কথায় আপত্তি দেখা গেল না, ভবেশেরও না।

"বেশ ত'!" ভবেশ বল্লে, "কিসের গল্প হবে? বল্ সুরেন, একটা ভূতের গল্পই বল, এ-বাড়িতে বেশ লাগবে!"

বসন্ত তাড়াতাড়ি বল্লে,—"না, না!"

"যাঃ, তুই একেবারে ভীতুর একশেষ! বল্ সুরেন!"

সুরেন ম্লানভাবে একটু হেসে বল্লে,—"বল্‌ব তাহলে? শোন্—'আন্‌বিট্‌ন্ ইলেভেন্' বলে এক টীম গেছল নসীপুরে..."

আমরা সবাই একটু হাসলাম। ভবেশ বল্লে,—"আহা, বলতেই দাও ওকে!"

সুরেন বলতে সুরু করলে,—আমাদের নসীপুর আসা ও তার পরের ঘটনার সে যা বর্ণনা দিলে, তাতে অন্য সময় হ'লে হাসিই পেত নিশ্চয়, কিন্তু ঘরে এখন সাড়াশব্দ বিশেষ নেই। গল্প শেষে ভূতুড়ে বাড়ি পর্য্যন্ত এসে পেঁছিল, সেখানকার ঘটনাগুলো একে একে শেষ করে সুরেন বল্লে,—"ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত, বাইরে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত শব্দ, আরো নানারকম বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ! ঘরে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলোয় একজন গল্প বলছে,—ভূতের গল্প।"

কেউ সে-গল্পে বিশ্বাস করে না; গল্প যে বলছে, সে হঠাৎ একটা তাস নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে,—"অশরীরী কেউ এখানে থাকে ত' এ-তাস বাতাসে মিলিয়ে যাক্।"

হাসতে গিয়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

উদয় বল্লে,—"আরে, তাসটা পড়ল কোথায়?"

সুরেন সত্যি সত্যিই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে একটা তাস ওপরে ছুঁড়ে দিল।

ভবেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বলবার চেষ্টা করলে,—"পড়েছে কোথাও ওদিকে!"

"ওদিকে কোথায়?" উদয়ের গলার স্বর তীক্ষ্ণ।—"ওদিকে ত' খালি মেঝে। এ-ঘরে ত' জিনিষ লুকিয়ে থাকবার মত জায়গা নেই!"

আমি তবু উঠে বসন্তের বিছানার আশপাশ সমস্ত ভাল করে খুঁজলাম! অন্য সবাইও তন্ন তন্ন করে সমস্ত ঘর খুঁজে দেখল।

আশ্চর্য্য! আমাদের সকলের মুখ গম্ভীর! শুধু বসন্তের নয়, আমাদের কপালেও ঘাম দেখা দিয়েছে!

ভবেশ হঠাৎ অকারণে অত্যন্ত রেগে উঠে বল্লে,—"কি তোমরা যা তা করছ! পাগল হলে নাকি সবাই? নাও সুরেন, গল্প বলো!"

শুক্‌নো পাংশু মুখে আমরা যন্ত্রচালিতের মত আবার এসে বসলাম। সুরেনের মুখে যেন রক্ত নেই! সকলের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার একটা তাস তুলে নিলে, তারপর বল্লে,—"আগের তাসটা উড়ে গেল..."

ভবেশ শুধু বল্লে,—"হুঁ!"

আবার একটা তাস নিয়ে গল্পের কথক বল্লে,—"উড়ে যাওয়াটা প্রমাণ নয়!"—সুরেনের স্বর অত্যন্ত অস্ফুট—"এবারের তাস থেকে একটা মস্ত কালো বেড়াল বেরিয়ে..."

বসন্তের চীৎকার বুঝি সকলের ওপরে শোনা গেল! তার বিছানার ঠিক পায়ের কাছে...

* * * *

না, সেবার আমরা অক্ষত দেহেই তার পরদিন কলকাতায় ফিরেছিলাম। শুধু বসন্তর জ্বরটা বিকারে দাঁড়িয়েছিল কলকাতায় এসে। বেচারাকে ভুগতে হয়েছিল অনেক দিন।

ভূতের গান

—ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘুমের ঘোরে শুনছি যেন "কুহু ও কেকা"র ঠিক সেই পাল্কীর গানটা! কিন্তু কথাগুলো সব উল্টোপাল্টা আর সুরটাও বেখাপ্পা বেয়াড়া—বেজায় ভূতুড়ে। কেবল হাড় খট্‌খট্‌, দাঁত খিট্‌মিট, গোঙানি আর কাতরানি শুনে যে গায়ে জ্বর এল। ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু তবু শুনছি—

চলে চলে
হুমকি তালে
পংখী গালে
মাসিপিসি
বাঘ বেড়ালে।
ভূত্‌পেরেতে
চলছে রেতে
হন্‌হনিয়ে
ভূত্‌পেরেতে।
পাল্কী দোলে
উঠ্‌তি আলে
নাল্‌কি দোলে
নাম্‌তি খালে।

আলো-আঁধারে
শেওড়াগাছ
কালোয়-সাদায়
বেড়াল নাচ।

সারা নদী
বালির ঘাট
মনসাতলায়
মাছের হাট।

ভূতের জমা
ভূতের জমী
ভূত্‌পেরেতে
নাইক কমি
উড়ছে কতক
ভন্‌ভনিয়ে
চলছে কতক
হন্‌হনিয়ে
হন্‌হনিয়ে
ঢুলছে কতক
গাছতলাতে
দুলছে কতক
তালপাতাতে
দিনদুপুরে
বাদুড় ঘুমায়
রাতদুপুরে
হুতুম থুমোয়!
ভোঁদড় ভাম
বেঙ্‌-বেঙাচি
টিক্‌টিকি আর
কানামাছি।

গঙ্গাফড়িং
জোনাক-পোকা
আরসোল্লা
ন্যাংটা খোকা।

ছুঁচো, ইঁদুর
খ্যাঁক্‌শেয়াল
শুকনো পাতা
গাছের ডাল।

সব ভূতুড়ে
সব ভূতুড়ে
ঘূর্ণি-হাওয়ায়
চলছে ঘুরে
জগৎ জুড়ে
ঘুরছে ধুলো
চলছে ঘুরে।

জগৎ জুড়ে
ঘুরছে ধুলো।
বাতাস দিয়ে
দুলছে কুলো!!

সব ভূতুড়ে
সব ভূতুড়ে
আলো-আলেয়া
জ্বলছে দূরে।

সব ভূতুড়ে
ভূতের খেলা
খেজুরতলায়
ইঁটের ঢেলা.....

গান শুনছি একবার—"ছুঁচো, ইঁদুর, কানামাছি, ভোঁদড়, পেঁচা, টিক্‌টিকি, খ্যাঁকশেয়াল।" গানটা শুনছি দুবার, "গঙ্গাফড়িং, জোনাক-পোকা, আরসোল্লা, বাদুড়—।" গানটা শুনছি তিনবার, "আলো-আলেয়া, ঘূর্ণি-হাওয়া, খেজুর গাছ, ইঁটের ঢেলা—।" একবার, দুবার, তিনবার—বারবার তিনবার ইঁটের ঢেলা পড়ছে কি, আর পাল্কিসুদ্ধ আমাকে ভূতগুলো ঝপাং করে মাটিতে ফেলে খেজুর গাছের তলায় একটা মরা গরু পড়েছিল, সেটাকে নিয়ে লুফ্‌তে লুফ্‌তে দৌড় মেরেছে।

ছবির ভূত

—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরীতে বসে একদিন সকালবেলা পরাশর ডাক্তার চিঠি লিখছিলেন। চোরের মত নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নগেন ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তাঁর টেবিল ঘেঁসে দাঁড়াল। পরাশর ডাক্তার মুখ না তুলেই বললেন, 'বোস, নগেন।'

চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরে চাকরকে ডেকে সেটি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আবার নগেনের দিকে তাকালেন।

—'বসতে বললাম যে? এরকম চেহারা হয়েছে কেন? অসুখ নাকি?'

নগেন ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে,

সে চুরি করে কি না, এইরকম অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে সে বলল, 'না, না, অসুখ নয়, অসুখ আবার কিসের!'

গুরুতর কিছু যে ঘটেছে, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে পরাশর ডাক্তার দু'হাতের আঙ্গুলের ডগাগুলি একত্র করে নগেনকে দেখতে লাগলেন। মোটাসোটা হাসিখুসী ছেলেটার তেল-চক্‌চকে চামড়া পর্য্যন্ত যেন শুকিয়ে গেছে, মুখে হাসির চিহ্নটুকুও নেই। চাউনি একটু উদ্‌ভ্রান্ত। কথা বলার ভঙ্গি কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে!

নগেন তার মামাবাড়ীতে থেকে কলেজে পড়ে। মাস দুই আগে নগেনের মামার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে পরাশর ডাক্তার নগেনকে দেখেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কি ঘটেছে, ছেলেটা যাতে এ-রকম বদলে যেতে পারে? ছেলেবেলা থেকে মামাবাড়ীতেই সে মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু মামার শোকে এ-রকম কাহিল হয়ে পড়ার মত আকর্ষণ তো মামার জন্য তার কোনদিন ছিল না! বড়লোক কৃপণ মামার যে-ধরনের আদর বেচারী চিরকাল পেয়ে এসেছে, তাতে মামার পরলোক-যাত্রায় তার খুব বেশী দুঃখ হবার কথা নয়। বাইরে মামাকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখালেও মনে মনে নগেন যে তাকে প্রায়ই যমের বাড়ী পাঠাত, তাও পরাশর ডাক্তার ভাল করেই জানতেন। পড়ার খরচের জন্য দুশ্চিন্তা হওয়ার কারণও নগেনের নেই, কারণ, শেষ-সময়ে কি ভেবে তার মামা তার নামে মোটা টাকা উইল করে রেখে গেছেন।

নগেন হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, 'ডাক্তার-কাকা, সত্যি করে একটা কথা বলবেন? আমি কি পাগল হয়ে গেছি?'

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'তোমার মাথা হয়ে গেছ। পাগল হওয়া কি মুখের কথা রে বাবা! পাগল যে হয়, অত সহজে সে টের পায় না, সে পাগল হয়ে গেছে!'

'তবে—' দ্বিধা ভরে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আচ্ছা ডাক্তার-কাকা, প্রেতাত্মা আছে?'

'প্রেতাত্মা মানে তো ভূত? নেই।'

'নেই? তবে—'

অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করে, অনেক ভূমিকা করে, অনেকবার শিউরে উঠে নগেন ধীরে ধীরে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল। চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনী! বিশ্বাস করা শক্ত হলেও পরাশর ডাক্তার বিশ্বাস করলেন। মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাঁকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয়, তিনি তা জানতেন।

মামা তাকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন জেনে প্রথমটা নগেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মামার এ-রকম উদারতা সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। বাইরে যেমন ব্যবহারই করে থাকুন, মামা তাকে নিজের ছেলেদের মতই ভালবাসতেন জেনে পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তিতে

তার মন ভরে গেল। আর সেই সঙ্গে জাগল, এইরকম দেবতার মত মানুষকে সারাজীবন ভক্তি-ভালবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে, দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ।

শ্রাদ্ধের দিন অনেক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার পর অনুতাপটা যেন বেড়ে গেল—শুয়ে শুয়ে সে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। হঠাৎ একসময় তার মনে হ'ল, সারাজীবন তো ভক্তি-শ্রদ্ধার ভান করে মামাকে সে ঠকিয়েছে, এখন যদি সত্য-সত্যই ভক্তি-শ্রদ্ধা জেগে থাকে, লাইব্রেরী-ঘরে মামার তৈল-চিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এলে হয়তো আত্মগ্লানি একটু কমবে, মনটা শান্ত হবে।

রাত্রি তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে, সকলে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে—বাড়ী অন্ধকার। এত রাত্রে ঘুমানোর বদলে মামার তৈল-চিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়াটা যে রীতিমত খাপছাড়া ব্যাপার হবে, সে-জ্ঞান নগেনের ছিল। তাই কাজটা সকালের জন্য স্থগিত রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তখন তার মাথা গরম হয়ে গেছে। মন একটু শান্ত না হলে যে, ঘুম আসবার কোন সম্ভাবনা নেই, কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করার পর সেটা ভাল করেই টের পেয়ে শেষকালে মরিয়া হয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

লাইব্রেরীটি নগেনের দাদামহাশয়ের আমলের। লাইব্রেরী-সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোন মাথাব্যথা ছিল না। তাঁর আমলে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে লাইব্রেরীর পিছনে একটি পয়সাও খরচ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। আলমারী-কয়েকটি অল্পদামী আর অনেকদিনের পুরানো, ভিতরগুলি বেশীর ভাগ অদরকারী বাজে বইয়ে ঠাসা এবং উপরে বহুকালের ছেঁড়া মাসিকপত্র আর নানারকম ভাঙ্গা-চোরা ঘরোয়া জিনিষ গাদা করা। টেবিলটি এবং চেয়ার কয়েকটি খুব সম্ভব অন্য ঘর থেকে পেনসন পেয়ে এঘরে স্থান পেয়েছে। দেয়ালে তিনটি বড় বড় তৈল-চিত্র, সস্তা ফ্রেমে-বাঁধানো কয়েকটা সাধারণ রঙীন ছবি ও ফটো টাঙ্গানো। তাছাড়া, কয়েকটা পুরানো ক্যালেণ্ডারের ছবিও আছে—কোনটাতে ডিসেম্বর, কোনটাতে চৈত্রমাসের বার তারিখ লেখা কাগজের ফলক এখনও ঝুলছে।

তৈল-চিত্রের একটি নগেনের দাদামশায়ের, একটি দিদিমার এবং অপরটি তার মামার। দাদামশায় আর দিদিমার তৈল-চিত্র দুটি একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি টাঙ্গানো আছে, মামার তৈল-চিত্রটি স্থান জুড়ে আছে পাশের দেয়ালের মাঝামাঝি।

কারও ঘুম ভেঙ্গে যাবার ভয়ে নগেন আলো জ্বালেনি। কিন্তু তাতে তার কোন অসুবিধা ছিল না, ছেলেবেলা থেকে এ-বাড়ীর আনাচে-কানাচের সঙ্গে তার পরিচয়। লাইব্রেরীতে ঢুকে অন্ধকারেই সে মামার তৈল-চিত্রের কাছে এগিয়ে গেল। অস্ফুটস্বরে 'আমায় ক্ষমা কর মামা' বলে যেই সে তৈল-চিত্রের পায়ের কাছে আন্দাজে স্পর্শ করেছে—বর্ণনার এইখানে পৌঁছে নগেন শিউরে চুপ করে গেল। তার মুখ আরও বেশী ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, দু'চোখ বিস্ফারিত।

'তারপর?'

নগেন ঢোঁক গিলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'যেই ছবি ছুঁয়েছি ডাক্তার-কাকা, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। সমস্ত শরীরটা ঝন্ ঝন্ করে উঠলো। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দেখি, সকাল হয়ে গেছে, আমি মামার ছবির নীচে মেঝেতে পড়ে আছি।'

পরাশর ডাক্তার গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আগে কোনদিন ফিট্ হয়েছিল নগেন?'

নগেন মাথা নেড়ে বলল, 'ফিট্? না, কস্মিন্‌কালেও আমার ফিট্ হয়নি! আপনি ভুল করছেন ডাক্তার-কাকা, এ ফিট্ নয়; মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে, মামাও জানতে পেরেছেন টাকার লোভে আমি তাঁকে মিথ্যা ভক্তি দেখাতাম। তাই ছবি ছোঁয়ামাত্র রাগে ঘেন্নায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সবটা শুনুন আগে, তাহলে বুঝতে পারবেন।'

সমস্ত সকালটা নগেন মরার মত বিছানায় পড়ে রইল। এই চিন্তাটাই কেবল তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল, ভক্তি ভালবাসার ছলনায় টাকা আদায় করে নিয়েছে বলে পরলোকে গিয়েও তার ওপর মামার এমন জোরালো বিতৃষ্ণা জেগেছে যে, তৈল-চিত্রটি পর্য্যন্ত তিনি তাকে স্পর্শ করতে দিতে রাজী নন। যাই হোক, নগেন একালের ছেলে, প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর, তার মনে নানারকম দ্বিধা সন্দেহ জাগতে লাগল। কে জানে রাত্রে যা ঘটেছে, তা নিছক স্বপ্ন কি না! ধৈর্য্য ধরতে না পেরে দুপুরবেলা সে আবার লাইব্রেরীতে গিয়ে মামার তৈলচিত্র স্পর্শ করে প্রণাম করল। একবার যদি মামা রাগ দেখিয়ে থাকেন, আবার দেখাবেন না কেন?

এবার কিছুই ঘটল না। শরীরটা অবশ্য খুব খারাপ হয়ে আছে, মেঝেতে ধাক্কা যেখানে লেগেছিল, মাথার সেখানটা ফুলে টন টন করছে এবং সকালে লাইব্রেরীতে মামার তৈলচিত্রের নীচে মেঝেতেই তার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু এতে বড়জোর প্রমাণ হয়, রাত্রে ঘুমের মধ্যেই হোক আর জাগ্রত অবস্থাতেই হোক, লাইব্রেরীতে গিয়ে সে একটা আছাড় খেয়েছিল। নিজের তৈলচিত্রে ভর করে মামাই যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন, তার কি প্রমাণ আছে?

নগেন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু বেশীক্ষণ তার মনের শান্তি টিকল না। রাত্রে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার তো ভুল হয়েছে! দিনের বেলা তাকে ধাক্কা দেওয়ার মত ক্ষমতা তো তার মামার এখন নেই, রাত্রি ছাড়া তার মামা তো এখন কিছুই করতে পারেন না! কি সর্ব্বনাশ! তবে তো রাত্রে আরেকবার মামার তৈলচিত্র না ছুঁয়ে কাল রাত্রের ব্যাপারকে স্বপ্ন বলা যায় না।

এত রাত্রে আবার লাইব্রেরীতে যাওয়ার কথা ভেবেই নগেনের হৃৎকম্প হতে লাগল। কিন্তু এমন একটা সন্দেহ না মিটিয়েই বা মানুষের চলে কি করে? খানিক পরে নগেন আবার লাইব্রেরীতে হাজির। ভয়ে বুক কাঁপছে, ছুটে পালাতে

ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কি এক অদম্য আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে মামার তৈলচিত্রের দিকে। ঘরে ঢুকেই সে স্যুইচ টিপে আলো জেবলে দিল। মটকার পাঞ্জাবীর ওপর দামী শাল গায়ে মামা দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে একজোড়া মোটা গোঁফ, চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি। নগেন এগিয়ে গিয়ে মামার পায়ের কাছে ছবি স্পর্শ করল। কেউ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে না, কিন্তু সমস্ত শরীরটা হঠাৎ যেন কেমন অস্থির অস্থির করতে লাগল! তৈলচিত্র থেকে কি যেন তার মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে।

তবু নগেন যেন বাঁচল। ভয়ের জন্য শরীর এ-রকম অস্থির করতে পারে। সেটা সামান্য ব্যাপার।

ফিরে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়েই নগেন আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আরেকটা কথা মনে এসেছে। কাল ঘর অন্ধকার ছিল, আজ আলো থাকার জন্য যদি মামা কিছু না করে থাকেন? নগেনের ভয় অনেকটা কমে গিয়েছিল, অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই সে অন্ধকারে তৈলচিত্রের কাছে ফিরে গেল। সে জানে, অন্ধকারে তৈলচিত্র স্পর্শ করলেও কিছু হবে না। ঘরে একটা আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না, তাতে বিশেষ কি আসে যায়? ইতস্ততঃ না করেই সে সোজা তৈলচিত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণে—

'ঠিক প্রথম-রাতের মত জোরে ধাক্কা দিয়ে মামা আমায় ফেলে দিলেন ডাক্তার-কাকা!'

'অজ্ঞান হয়ে গেলে?'

'না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাইনি! অবশ আচ্ছন্নের মত অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়ে ছিলাম, কিন্তু জ্ঞান ছিল। তারপর থেকে আমি ঠিক পাগলের মত হয়ে গেছি ডাক্তার-কাকা! দিনরাত কেবল এই কথাই ভাবি। রোজ কতবার ঠিক করি বাড়ী ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাব, কিন্তু যেতে পারি না, কিসে যেন আমায় জোর করে আটকে রেখেছে!'

পরাশর ডাক্তার অনেকক্ষণ ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর আর কোনদিন ছবিটা ছুঁয়েছ?'

'কতবার। দিনে ছুঁয়েছি, রাত্রে ছুঁয়েছি, আলো জেবলে ছুঁয়েছি, অন্ধকারে ছুঁয়েছি। ঠিক ওইরকম ব্যাপার ঘটে। দিনে বা রাত্রে আলো জেবলে ছুঁলে কিছু হয় না, অন্ধকারে ছোঁয়ামাত্র মামা আমাকে ঠেলে দেন। সমস্ত শরীর যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে! কোনদিন অজ্ঞান হয়ে যাই, কোনদিন জ্ঞান থাকে।'

বলতে বলতে নগেন যেন একেবারে ভেঙে পড়ল, 'আমি কি করব ডাক্তার-কাকা? এমন করে ক'দিন চলবে? মাঝে মাঝে আত্মহত্যার কথা ভাবি।'

পরাশর ডাক্তার বললেন, 'তার দরকার হবে না। আমি সব ঠিক করে দেব।

আজ সকলে ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রি ঠিক বারোটার সময় তুমি বাইরের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, আমি যাব।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'ভূত বলে কিছু নেই, নগেন।'

তবু মাঝরাত্রে অন্ধকার লাইব্রেরীতে পরাশর ডাক্তার মৃদু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ ঘরে বাড়ীর লোক খুব কম আসে। ঘরের বাতাসে পুরানো কাগজের একটা ভাপসা গন্ধ পাওয়া যায়। নগেন শক্ত করে তার একটা হাত চেপে ধরে কাঁপছে। কিসের ভয়? ভূতের? তৈলচিত্রের ভূতের? ভূতে যে একেবারে বিশ্বাস করে না, যার বদ্ধমূল ধারণা এই যে, যত সব অদ্ভুত অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায় তার প্রত্যেকটির সাধারণ ও স্বাভাবিক কোন ব্যাখ্যা আছেই আছে, ছবির ভূতের অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য ভূতের ঘরে পা দিয়ে তার কখনো কি ভয় হতে পারে? তবু অস্বস্তি যে বোধ হচ্ছে, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নগেন যে কাহিনী শুনিয়েছে, সারাদিন ভেবেও পরাশর ডাক্তার তার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা কল্পনা করতে পারেন নি। একদিন নয়, একবার নয়, ব্যাপারটা ঘটেছে অনেকবার। দিনে তৈলচিত্র নিস্তেজ হয়ে থাকে, রাত্রে তার তেজ বাড়ে। কেবল তাই নয়, অন্ধকার না হলে সে তেজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। আরও একটা কথা, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে তৈলচিত্র যেন বেশী সজীব হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম রাত্রে নগেন অন্ধকারে স্পর্শ করলে ছবি নগেনের হাতটা শুধু ছিটকিয়ে সরিয়ে দিয়েছে; মাঝরাত্রে স্পর্শ করলে এত জোরে তাকে ধাক্কা দিয়েছে যে, মেঝেতে আছড়ে পড়ে নগেনের জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে।

অশরীরী শক্তি কল্পনা করা ছাড়া এ-সমস্তের আর কি মানে হয়?

হয়—নিশ্চয় হয়; মনে মনে নিজেকে ধমক দিয়ে পরাশর ডাক্তার নিজেকে এই কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন দেয়ালের যেখানে নগেনের মামার তৈলচিত্রটি ছিল। এ ঘরে তিনি আগেও কয়েকবার এসেছেন, তৈলচিত্রগুলির অবস্থান তাঁর অজানা ছিল না। যা চোখে পড়ল তাতে পরাশর ডাক্তারের বুকটাও ধড়াস্ করে উঠল। তৈলচিত্রের উপরের দিকে দু'টি উজ্জ্বল চোখ তাঁর দিকে জ্বল্ জ্বল্ করে তাকিয়ে আছে। চোখ দু'টির মধ্যে ফাঁক প্রায় দেড় হাত।

ঠিক এই সময় নগেন ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আলোটা জ্বালব ডাক্তার-কাকা?'

পরাশর ডাক্তার তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন।—'না।'

রাস্তা অথবা পাশের কোন বাড়ী থেকে সরু আলোর রেখা ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছে। তাতে অন্ধকার কমেনি, মনে হচ্ছে যেন সেই আলোটুকুতে ঘরের অন্ধকারটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র।

নগেন আবার ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি ডাক্তার-কাকা। দাদামশায় আর দিদিমার ছবি তাঁরা মরবার পর করা হয়েছিল, কিন্তু

মামার ছবিটা মরবার আগে মামা নিজে সখ করে আঁকিয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্যেই—'

নগেনের শিহরণ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। 'ভয় পেয়ে গেছেন?'

পরাশর ডাক্তারকে স্বীকার করতে হল, একটু ভয় তিনি সত্যই পেয়ে গেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক মন এতদিন পরে একটা মস্ত সত্য আবিষ্কার করল যে, মানুষের মন চিরদিনই মানুষের মন। যুক্তি, তর্ক, বিশ্বাস, অবিশ্বাস দিয়ে মানুষ ভয়কে জয় করতে পারে না। দেহে আঘাত লাগলে যেমন বেদনা বোধ হবেই, তেমনি উপযুক্ত ভয়ের কারণ উপস্থিত হলে মানুষকে ভয় পেতেই হবে।

যাই হোক, একদিন যদি তিনি ভুল বিশ্বাস পোষণ করে এসে থাকেন, আজ ছবির ভূতের কল্যাণে সে ভুল তাঁর ভেঙ্গে যাবে। তাতে ক্ষতি কি? দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পরাশর ডাক্তার তৈলচিত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতে জ্বল্-জ্বলে চোখ দু'টির জ্যোতি অনেক কমে গেল!

হাত বাড়িয়ে দিতে প্রথমে তাঁর হাত পড়ল দেয়ালে। যত সাহস করেই এগিয়ে এসে থাকুন, প্রথমেই একেবারে নগেনের মামার গায়ে হাত দিতে তাঁর কেমন দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। পাশের দিকে হাত সরিয়ে তৈল-চিত্রের ফ্রেম স্পর্শ করা মাত্র বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন তাঁর শরীরটা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ করে পিছন দিকে দু'পা ছিটকে গিয়ে তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন।

পরক্ষণে ভয়ে অর্দ্ধমৃত নগেন আলোর স্যুইচ টিপে দিলে।

মিনিট-পাঁচেক পরাশর ডাক্তার চোখ বুজে বসে রইলেন, তারপর চোখ মেলে মিনিট-পাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মামার রুপার ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রটির দিকে।

তারপর তীব্র চাপা গলায় তিনি বললেন, 'তুমি একটি আস্ত গর্দ্দভ নগেন!'

* * * *

রাগ একটু কমলে পরাশর ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'গাধাও তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান্। এত কথা বলতে পারলে আমাকে, আর এই কথাটা একবার বলতে পারতে না যে, তোমার মামার ছবিটা ইতিমধ্যে রুপার ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে, আর ছবির সঙ্গে লাগিয়ে দু'টো ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট্ করা হয়েছে?'

'আমি কি জানি! ছ' মাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ছবিটা এখনো তেমনি অবস্থাতেই আছে।'

'ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে বুঝতে পার না কিসে শক্ লাগল, তুমি কোন্দেশী ছেলে? আমি তো শক্ খাওয়ামাত্র টের পেয়ে গিয়েছিলাম তোমার মামার ছবিতে কোন্ প্রেতাত্মা ভর করেছেন?'

নগেন উদ্‌ভ্রান্তের মত বলল, 'রুপার ফ্রেমটা দাদামশায়ের ছবিতে ছিল, চুরি যাবার ভয়ে মামা অনেকদিন আগে সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন। মামার শ্রাদ্ধের দিন

মামীমা ফ্রেমটা বার করে মামার ছবিটা বাঁধিয়েছিলেন। আলো দু'টো লাগিয়েছে আমার মামাতো ভাই পরেশ।'

'হ্যাঁ। সে এ-বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাই বলল, এই সামান্য কাজের জন্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে পয়সা দেব কেন?'

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে। কিন্তু পয়সা বাঁচানোর জন্য বাপের ছবিতে ভূত এনে ছেড়েছে। এ খবরটা যদি আগে দিতে আমায়—।'

নগেন সংশয়ভরে বলল, 'কিন্তু ডাক্তার-কাকা—'

পরাশর ডাক্তার রাগ করে বললেন, 'কিন্তু কি? এখনো বুঝতে পারছ না? দিনের বেলা মেন-স্যুইচ অফ্ করা থাকে, তাই ছবি ছুঁলে কিছু হয় না,—ছবি মানে ছবির রুপার ফ্রেমটা। রুপার ফ্রেমটার নীচে কাটফাট কিছু আছে, দেয়ালের সঙ্গে যোগ নেই, নইলে তোমাদের ইলেকট্রিকের বিল এমন হু হু করে বেড়ে যেত যে, কোম্পানীর লোককে এসে 'লিকেজ' খুঁজতে হত। তুমিও মামার ভূতের আসল পরিচয়টা জানতে পারতে।

সন্ধ্যার পর বাড়ীর সমস্ত আলো জ্বলে, আর বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে যাতায়াত করতে বেশী ভালবাসে কিনা, তাই সে সময় ছবি ছুঁলে তোমার কিছু হয় না। এ ঘরের আলোটা জ্বাললেও তাই হয়। মাঝরাত্রে বাড়ীর সমস্ত আলো নিভে যায়, তখন ছবিটা ছুঁলে আর কোন পথ খোলা নেই দেখে বিদ্যুৎ অগত্যা তোমার মত বোকা হাবার শরীরটা দিয়েই—'

পরাশর ডাক্তার চুপ করে গেলেন। তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, সুযোগ পেলে তাঁর শরীরটা পথ হিসাবে ব্যবহার করতেও বিদ্যুৎ দ্বিধা করে না।

টাকা নিয়ে যাও, কিন্তু আমায় তোমরা মেরে যেয়ো না বাবা !'

—হাত বাড়াতেই আর একখানা হাত চাদরের ভিতর থেকে বেরিয়ে তাঁর হাতে এসে ঠেকল,—মাংসহীন হাত আস্ত একখানা হাড় !

আমার ভূত দেখা

—শিবরাম চক্রবর্ত্তী

গোড়াতেই বলে রাখি, এটা হাসির গল্প নয়। কেননা, ভূত দেখা, আর যাই হোক্, হাস্যকর ব্যাপার নয় নিশ্চয়ই।

এবং এও বলা দরকার যে, এটা গল্পও নয়! আন্‌কোরা সত্য ঘটনা। ভূত দেখার মতো সত্য ঘটনা, সত্যিকারের দুর্ঘটনা আর কী আছে? যাঁরাই ভূত দেখেছেন, আমাদের মধ্যে অনেকের জীবনেই হয়তো এই দুর্যোগ ঘটে থাক্‌বে, তাঁরা সবাই একবাক্যে আমার সাক্ষ্য দেবেন।

ভূতের গল্প মানেই সত্যিকারের গল্প।

অবশ্যি, এও বল্‌তে চাই, এক জীবনে অদ্ভুত আমি অনেক কিছুই দেখেছি, এবং এখনও দেখ্‌তে হচ্ছে, কিন্তু ভূত আমি সেই একটিই—বা একসঙ্গে সেই দুটিই —যা একবার দেখেছিলাম!

বিনি আর আমি বাড়ীর খোঁজে বেরিয়েছি, পুরণো বাসায় মন টিক্‌ছে না। নতুন একটা আবাস দেখে উঠে যাব, এই বাসনা। এক জায়গাতে কতদিন আর মাথা গোঁজা যায়? খাঁচার পোষা জানোয়ারদেরই পোষায় কেবল। চোর ছ্যাঁচোড়রা ন্যাওটা না হলেও, চামচিকেরা এসে আড্ডা না গাড়লেও, কাঁকড়া-বিছেরা যখন তখন যেখানে সেখানে দেখা না দিলেও, আর্সোলারা ফর্‌ ফর্‌ আর ধেড়ে ইঁদুররা ধর্‌ ধর্‌ করে ঘরময় না ঘুরলেও, তেমন কিছু অনিষ্ট না ঘটলেও, এক জায়গায় ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকাটা—এম্‌নিতেই কেমন খারাপ লাগে না কি? ভাড়াটে বাড়ী আঁকড়ে, মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে থাকা একটু বাড়াবাড়ি দেখায় না? পৈতৃক ভিটে নয় কিছু, পরকে টাকা গুণে পরের বাড়ীতে তৎপর হয়ে থাকব—অতটা পরার্থপর হওয়া কি ভাল?

সেদিন সকালে বিনি, অকারণেই কলতলায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। এবং উঠেই বল্ল, প্রথম কথাই বল্ল সেঃ

"এই আস্তাবলটা এবার ছাড়ো তো বাপু!"

"এই আস্তানাটা এইবার বদলানো দরকার। বহুদিন তো কাট্‌ল।" আমিও ওর হ্রেষাধ্বনিতে যোগ দিয়েছি। তার একটু আগেই বিছানায় কালির দোয়াতটা উল্‌টেছিলাম, কাজেই আমার সহানুভূতির অভাব ছিল না। এবং তারপরেই আমরা তীরবেগে রাস্তায় পড়ে বাড়ী খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছি।

কিন্তু মনের মত বাসা আর পাই কই? 'টু-লেট্‌' দেখলেই এগিয়ে যাই, খানিকক্ষণ লট্‌কে থাকি, তারপর আরো একটু বেশি দেখে ছিটকে বেরিয়ে আসতে হয়।

'টু লেট্‌' তো চারিধারেই ছড়ানো, অনেক বাড়ীতে ভাড়াটে এসে জুটলেও ছাড়ানো হয় নি। নতুন বাসিন্দারাই নড়াতে দ্যায় নি, ভাড়া করার দ্বিতীয় দিনেই, কড়ার করে বাড়ী ছাড়ার নোটিশ দিয়ে রেখেছে। কড়া নোটিশ।

পয়সা খসিয়ে ইট-কাঠ বসিয়ে এসব কি বানিয়ে রেখেছে এরা? জমির ওপর এসব কী জমিয়ে রেখেছে? দেখে দেখে বিরক্ত ধরে গেল। এদের—এইসব অট্টালিকাদের ধরাশায়ী করবার জন্যেই, অনতিবিলম্বে বড় গোছের ভূমিকম্প কিম্বা এয়ার-রেড একটা কিছু হওয়া দরকার।

অবশেষে, বেহালার দিকে একটা ভালো বাড়ীর খোঁজ পেলুম। আমরা যেমনটি চাই ঠিক তেমনটিই নাকি বাড়ীটি! অল্প ক'খানি ঘর নিয়ে ছোট্টখাট্টর মধ্যে, অথচ ভাড়াও বেশী নয়, এমন কি তার একতলার ঘরগুলোও তালাক্‌ দেবার মতো না!

তালা দিয়ে না রেখে ব্যবহার করবার মতো। সামনে একটু লনের মতও রয়েছে নাকি!

খবর পেয়েই ছুট্ দিলুম। বিনি আর আমি।

খবরটা উড়ে এলেও, একেবারে উড়ো খবর নয়। অনির্ব্বচনীয় না হলেও, পছন্দসই সত্যই। আশপাশ থেকে, এ-কোণ ও-কোণ নানান্ কোণ থেকে, নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে উপাদেয় বলেই বোধ হোলো বাড়ীটাকে। বা'র থেকে তো ভালোই, এবার ভেতরে পা বাড়িয়ে দেখি।

বাড়ীওলার ছেলে এসে সদরের তালা খুলে দিলে। তালার ওপর ধুলো জমে রয়েছে। মাথার চৌকাঠে মাকড়সার জাল লাগানো। দেয়ালে দেয়ালে চটা-উঠে-যাওয়া! সারা বাড়ীর আষ্টেপৃষ্ঠে কী একটা সাবেক কালের ছোপ—কেমন যেন একটা প্রত্নতত্ত্বের ছাপ মারা!

"পোড়ো বাড়ী নয়তো দাদা?" বিনি খুঁৎ খুঁৎ করে।

"না না! কী বলছেন?" ছেলেটি প্রতিবাদ জানায়ঃ "চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পোড়ে নি। তাহলে তো আমরা ইন্সিওরেন্সের টাকাগুলো পেতাম। বেশ মোটা টাকা!"

"য়্যাঁ, কী বল্লে?" আমি বিচলিত হই।

"দমকলওলারা এসে পড়ল কিনা।" ছেলেটি অভিযোগ করে। কিরকম একটা আধপোড়া ধরা গন্ধ বাড়ীটার গা থেকে এসে আমাদের নাকে ধাক্কা মারে। পুরণো ফিকে, কি জাতীয় একটা বিজাতীয় কেমন গন্ধ!

"কদ্দিন ভাড়া হয়নি, য়্যাঁ?" আমি জিজ্ঞেস করিঃ "আগের ভাড়াটেরা উঠে গেছে কদ্দিন?"

"তা বেশ—বেশ অল্প কিছুদিন।" ছেলেটি থেমে থেমে বলে।

"অল্প কিছুদিন? বলো কি? দরজায় মাকড়সার ওড়না বসানো দেখচি যে?"

"কী বল্‌চেন?" ছেলেটি বড়ো বড়ো চোখ করে' তাকায়।

"মাথার ওপর মাকড়সার জালিয়াতি দেখচি কিনা?" আমি সহজ করে' বলি এবার! এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজিতে, পরিষ্কার করে মানে করে' দিইঃ "দে হ্যাভ্ ফোর্জ্‌ড্ য়্যাহেড্!"

যাক্ ভেতরে তো পা বাড়াই।

ছেলেটি কিন্তু কিছুতেই সঙ্গে আসে না। বলেঃ "আমার ইস্কুলের টাইম হয়ে যাচ্ছে।"

"কতো আর দেরি হবে? ঘরগুলো একবার ঘুরে-ফিরে দেখা বইতো না!" আমি ওকে অভ্যর্থনা করি। "এসো এসো! চলে এসো!"

"আমি বাইরেই আছি। বেশ আছি।" ছেলেটি আমাদের প্রেরণা দ্যায়ঃ "যান না, ভয় কি? এখানেই তো আছি।"

দরজা খুলে মাকড়সার জাল্‌না ভেদ করে' ভেতরে তো ঢুকলাম। ঢুকে দেখলাম, যে-লোকটা খবর দিয়েছিল, নেহাৎ মিথ্যে বলে নি! পাকা সিমেণ্ট-করা, নীচের ঘরগুলো পর্য্যন্ত চমৎকার! সামনের লনে দিব্যি ব্যাডমিন্‌টন চলবে। ধুলো-বালি ঝেড়ে-ঝুড়ে ধোলাই করে' নিতে পারলে খাসাই হবে। বাড়ীখানি বেশ। ভাড়াও বেশী নয়। কলকাতার বুকে এ যে একেবারে রাজযোটক!

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠা গেল।

এবং উঠেই যা দেখলাম—সে এক দৃশ্য!

সাম্‌নের ঘর থেকে দু'টি যুবক—হৃষ্টপুষ্ট দু'টি যুবক—যদিও সে সময়ে তারা যে খুব হৃষ্ট ছিল হলপ্‌ করে' একথা বলা যায় না—হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে বেরিয়ে এল—হুটোপাটি করতে করতেই বেরিয়ে এল। দু'জনের মধ্যে সে কী হাঁচোর-পাঁচোর ধস্তাধস্তি আর আছ্‌ড়া-পাছ্‌ড়ি। পরস্পরের ধাক্কা সামলাতেই দু'জনে বারান্দায় গিয়ে পড়েছে—একেবারে কাঠের রেলিংটার কাছ ঘেঁসে বারান্দার ধারটায়।

এ ওকে কিলোচ্ছে, সে তাকে কিলোচ্ছে। যে যাকে পাচ্ছে, বেকসুর কিলিয়ে নিচ্ছে!

দু'জনের মধ্যে সে কী তুমুল সংগ্রাম!

অতখানি বীরত্বের চোট্‌ সামান্য কাঠের রেলিং সইতে পারবে কেন?

সেই মুহূর্ত্তেই কাঠের গণ্ডী ভেঙে দু'জনেই—দু'জনাই—তারা—দারুণ তাল ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে—কোথায় আর? কোনো গতিকে কাঠের রেলিংয়ের মায়া একবার কাটাতে পারলে কোথায় আর যাওয়া যায়? সোজা নীচের দিকে, অধঃপতনের পথে, সিমেণ্ট দিয়ে শানানো একতলার উদ্দেশেই সটান রওনা হয়ে গেছে। ততক্ষণে তাদের চিহ্নমাত্রও নেই—অন্ততঃ বারান্দার ওপরে তো নেই! তাদের তখনকার চোখ-মুখের সেই ভীতিবিহ্বল চিত্র এ-জীবনে আমি ভুল্‌তে পারব না।

এত কাণ্ড ঘটে গেল আমাদের সামনেই—আমার আর বিনির চোখের ওপরেই!

এবং একেবারে নিঃশব্দেই ঘটে গেল!

বলা বাহুল্য, ও-রকম একটা দৃশ্যের পরে ও-বাড়ীতে আর ওঠা চলে না। ভূতে ভূত কিলোচ্ছে, এ-রকম দেখতে পাওয়া সচরাচর দুর্লভ, খুবই বিরল, তাতে ভুল নেই; কারণ, শোনা যায় এবং দেখাও গেছে (নিজের কানে এবং অন্যের চোখেই)—যে, ওরাই অপরদের, যারা ভূত নয় তাদের ধরে পাক্‌ড়ে মজা ক'রে পিটিয়ে নেয়। খবরের কাগজেও মাঝে মাঝে পড়া যায় বইকি!

তবু, দর্শনীয় হিসাবে যতই উপভোগ্য আর অভূতপূর্ব্ব হোক্‌ না কেন, সেই দুর্ম্মূল্য বিলাসিতা করতে গিয়ে কে ওদের কিলাতিশয্যের মধ্যে গিয়ে পড়বে?

তাছাড়া, বিনি আমাকে বুঝিয়ে দিল, এমনও তো হতে পারে, ওরা ষড়্‌যন্ত্র ক'রে একটা সন্ধিসূত্রে এসে, অবশেষে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে কিংবা বেওয়ারিশ বিবেচনায়, আমাদের দু'জনকে শতকরা পঞ্চাশের আধাআধি বখ্‌রায় নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা করে' নিতে পারে। ভাগাভাগি করে' বিনে পয়সায় মারামারির জন্যেই অবশ্যি।

এবং আমিও বিনিকে বুঝিয়ে দিলাম, সে-রকমটা হ'লে 'মারামারি' আর হবে না। কেননা, ভূতকে মারা আর যার দ্বারাই হোক্‌ আমায় দিয়ে অন্ততঃ হবার নয়। নিজের ক্ষতির ভয়ে নয়, ভূতের প্রতি মমতায় নয়, এবং কেবল যে আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত, তাই বলেও নয়, তবু আমার দুঃসাহসের একটা সীমা আছে তো! অতএব, ওটা কেবল এক তরফা, ভূতের জবানি, একচেটে 'মারী' হবে বলেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে এবং স্বচক্ষে যা দেখা গেল, যে-রকম একরোখা চল্‌তে থাকবে, তাতে মহামারী' তো বটেই।

অতএব বাড়ী বদ্‌লানো আর হলো না। সেই দুর্ঘটনার পর অপর কোনো অচেনা আড়তে ওঠা আমাদের সাহসে কুলালো না। কোথায় গিয়ে ফের কিম্বিধ ভূতের নিদর্শন পাবো, কে জানে! যেখানে আছি সেই ভালো! পুরাণো কোটরেই পুনর্মূষিক হয়ে পড়ে থাক্‌লাম। এই সাবেক আড্ডাটার সুবিধা এই (যেটা নতুন করেই সম্প্রতি আমাদের চোখে পড়ল), এখানে আশে-পাশে যে দু' একজন অবাঞ্ছনীয় রয়েছেন, তাঁরা নিতান্তই জলজ্যান্ত এবং জানাশোনার ভেতরে; এখন পর্য্যন্ত, এতদিনেও একটিও মৃত ভূতের সাক্ষাৎ আমরা পাই নি, এবং বিনির বিবেচনায় (আর আমারও ঐ মত), মৃত ভূতেরাই বেশী রকম ভয়াবহ।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, ইতিমধ্যে বিনি একদিন সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়েছে এবং এক রাত্তিরে আমি—আমি নিজেও খাট থেকে পিছলে গেছি, আর ছোটখাট হোঁচট্‌ তো লেগেই রয়েছে, চল্‌তে ফির্‌তে ঠোকাঠক্করও বড় কম খাচ্ছি না; এ-ছাড়া অম্লমধুর আছাড়ের তো কথাই নেই! তবু অখাদ্যের এত বাড়াবাড়িতেও, বাড়ী বদ্‌লানোর নাম কেউ মুখেও আনি নি। এতসব সত্ত্বেও চমৎকার শান্তির মধ্যে কালাতিপাত করা যাচ্ছে, এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

"আমি, আমি লালায়িত রায়—একজন লেখক।" বল্লেন তিনি।

"ও! তা—তা—" আমি আমতা আমতা করিঃ "আপনি লেখক? বেশ, বেশ!"

লোকটিকে, লেখকটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হয়!

"আমি আস্‌ছি বেহালা থেকে। 'আব্‌ছায়া' নামক পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষ থেকে। 'আব্‌ছায়া'র নাম শুনেছেন নিশ্চয়?"

"আব্‌ছায়া? শোনা শোনা বলেই মনে হচ্ছে তো! তা, কী দরকার বলুন।"

"আজ্ঞে, আব্‌ছায়া-সম্পাদক তুষানল ভট্ট—যিনি একাধিক বই লিখেছেন—"

"হাঁ, জানি। ভট্ট মহাশয়ের নাম শুনেছি। এক-আধখানা পড়েও থাক্‌ব। খুব অখাদ্য লেখেন না ভদ্রলোক।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালোই লেখেন। আমার চেয়ে ভালো না হলেও খুব মন্দ নয়। তাঁর কাছ থেকেই আস্‌ছি, এবং আমার নিজের কাছ থেকেও বটে। আমরা দু'জনেই 'আব্‌ছায়া'র—কি বলে গিয়ে—সৃষ্টিকর্ত্তা এবং রক্ষাকর্ত্তা...একমাত্র আর অদ্বিতীয়।"

"তা, তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কী কারণে আসা? আমি কি করতে পারি, বলুন?" এবং আনুষঙ্গিক জানিয়ে দিইঃ "সম্পাদকতা আমি করতে পারিনে।"

"না না না, সেজন্যে নয় এবং লেখার জন্যেও না। আমরা, আমরা আপনার কাছে লেখা-টেখা চাইনে, ভয় নেই, ছোট্ট একটু কাগজ, আমাদের নিজেদের লেখা ছেপেই কুলিয়ে উঠতে পারছিনে, তবে—তবে কিনা—" বল্‌তে বল্‌তে উনি থেমে যান্‌।

কিছুটা তখন আমি আশ্বস্ত হয়েছিঃ "তাহ'লে আর ভয় কি? বলুন। ব'লে ফেলুন!" ওঁকেও তখন ভরসা দিয়ে দিই।

"আজ্ঞে, আমরা আপনাকে একটা টী-পার্টি দিতে চাই। খুব ছোট্ট একটা টী-পার্টি। তার নিমন্ত্রণ করতেই আমি এসেছিলুম। আপনার সুবিধামত একদিন, যেদিন আপনি বল্‌বেন, আমাদের ওখানে গিয়ে দয়া ক'রে যদি যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ—"

জলযোগের আবাহনে কে না কাবার হয়? আমি একটু কাৎ হলুম।

"তা, কে কে থাক্‌বেন সেই পার্টিতে?" আমি জিজ্ঞেস করি, "নামকরা লেখকদের আর কেউ?"

"তাদের অনেককেই আমাদের করা হয়ে গেছে। তাঁদের খতম্‌ করেই আপনার কাছে এসেছি। এদিন কেবল আপনি আর আমরা। আমরা মানে, সম্পাদক তুষানলবাবু আর আমি। আমি হচ্ছি আমাদের 'আব্‌ছায়া'র সহকারী সম্পাদক এবং—এবং সহকারী সম্পাদক থেকে ষ্ট্রীট্‌-হকার পর্য্যন্ত সব। গুপ্ত কথাটা আপনাকে বল্‌তে আর দোষ কি? আপনি তো আমাদেরই একজন!"

"তা বেশ। আমরাও জন-দুই যাব। আমি আর বিনি। ওঃ বিনি? বিনি আমার ছোট বোন্‌।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা-সময়ের কিছু আগেই, বিনি আর আমি বেহালায় গিয়ে পেঁছিলাম। অনেক যুঝে ঠিকানাও খুঁজে বার করা গেল।

য়্যাঁ, এ যে সেই বাড়ী! সেই মারাত্মক বাড়াবাড়ি যার রেলিং ভেদ ক'রে একদা নীচে নেমে গেছল, সেই প্রাণ-নিয়ে-টানাটানি বাড়ীই যে!

দরজার মাথায় 'আব্‌ছায়া কার্য্যালয়', সাইনবোর্ড লট্‌কানো, এবং তার পাশেই সিনেমার লম্বা-চৌড়া বিজ্ঞাপন মেরে গেছেঃ

দেবদত্ত ফিল্‌মের
পথভুলে !
—তৎসহ—
সাবধান !!!

একে বিনি সারা রাস্তা পাশাপাশি 'তুমি ভুল করো না পথিক!' গুন্‌ গুন্‌ কর্‌তে কর্‌তে এসেছে, তার ওপরে ভূতপূর্ব্ব সেই বাড়ী আর তার গায়ে সাঁটা এই বিজ্ঞাপন—সাবধানাত্মক এই বাণী—দেখেই আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল। আমি আর আমার মধ্যে নেই!

আগুপিছু কর্‌তে কর্‌তে কখন কড়া নেড়ে বসেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছেন।

"এই যে। আপনারা! আপনারাই! আপনাদেরই অপেক্ষা কর্‌ছি"—অমায়িকভাবে করমর্দ্দনে তিনি এগিয়ে এলেনঃ "আমিই তুষানলবাবু। আমার সেই মাস্তুতো ভাইটি—আমাদের সহকারী সম্পাদক—তিনি একটু বেরিয়েছেন। এই এসে পড়লেন ব'লে! আপনারা আসুন।'

এই ব'লে আমাদের হস্তগত ক'রে তিনি ভেতরে নিয়ে গেলেন।

তুষানলবাবুকেও কোথায় যেন দেখেছি, চেনা চেনা বলেই সন্দেহ হলো। কোন সাহিত্যিকের আসরে বা সাহিত্য-বাসরেই দেখে থাক্‌ব হয়তো। আজকাল সব অলিগলিতেই তো লেখকের বৈঠক বেধে রয়েছে। সাহিত্যের আখ্‌ড়ার তো অভাব নেই! কাগজের ওপর কুস্তি করছে না কে?

দোতালায় সেই কাঠের রেলিং-ঘেরা বারান্দার কোণ ঘেঁষে, একটা তেপায়া টেবিল ঘিরে আমরা তিনজনে বসলুম! সেই কাঠের রেলিংটা তেমনি অক্ষত দেহে রয়েছে: এখনো ছিন্নভিন্ন হয় নি। একান্ত অকারণেই তখন আমাদের বুক মাঝে মাঝে ছম্‌ ছম্‌ ক'রে উঠ্‌লেও, নিতান্ত অমূলক ভয়েই এমন চমৎকার বাড়ীটা আমরা হাতছাড়া করেছি, তা বুঝতে বাকী ছিল না। কেননা, এই তুষানলবাবুরাই-বা এমন কি মন্দ আরামে এখানে বসবাস করছেন? তাঁরা যে সদাসর্ব্বদা, বা কালে-ভদ্রেও কখনো এস্থলে কোনো বিভীষিকা দেখেছেন বা দেখে আস্‌ছেন—তাঁদের চেহারায়, কই, তার চিহ্নমাত্রও তো নেই!

কাঠের রেলিংটা আমাদের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হাস্‌তে থাকে!

ভেবে দেখলে, ভূত জিনিষটা কি? অতীতের আব্‌ছায়া ছাড়া আর কিছু তো নয়? বিগতকালে যেসব ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, আকাশপটে তার পুনর্মুদ্রণ বই তো না? পৃথিবীর যত কিছু শব্দের মতো যাবতীয় দৃশ্যও তো আবহাওয়ার ভাঁড়ার-ঘরে জমা হয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগতই জম্‌ছে। আমাদের কান যদি কখনো রেডিয়োর পর্য্যায়ে ওঠে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ওঠে, তাহ'লে সেই মুহূর্ত্তেই আমরা আকাশবার্ত্তা শুন্‌তে পাই, দৈববাণী যার নাম দিয়েছি। তেমনি এই নশ্বর নেত্র যদি কখনো টেলিভিসনের পর্দ্দায় নামে, তাহ'লে তার আকস্মিক আভাসেই দৈবাৎ দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে যায়—যাকে বলি ভূত! কিন্তু বারবারই যে সেই একই দৃশ্য দেখব, বারংবারই এই চর্ম্মচক্ষু টেলিভিসনে পরিণত হবে, তার কি মানে আছে? হায় হায়, অন্ধতাবশে ভুলবশতঃ এমন যার-পর-নাই বাড়ীটা বেহাত হ'তে দেয়া বড্ড বোকামি হয়ে গেছে, মনের মধ্যে হা-হুতাশ হ'তে থাকে।

একটু পরেই, লালায়িত রায়, অকৃত্রিম সম্পাদকের সহযোগী সেই আদিম লেখক, একরাশ খাবারের মোট নিয়ে ফিরে এলেন। খাবারের সম্পাদনা করতেই তিনি বেরিয়েছিলেন, বোঝা গেল। কিন্তু তাঁকে দেখে, আর তাঁর হাতে খাবারের ঝুড়ি দেখে, কোথায় আমরা পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠব, তা না, ততক্ষণে আমাদের হয়ে এসেছে!

প্রথম দর্শন থেকেই ওঁদের দু'জনকে আমাদের চিনি চিনি ঠেক্‌ছিল, কিন্তু কেন যে এত মিঠে মনে হচ্ছিল, এখন ওঁদের উভয়কে একসঙ্গে দেখে, একেবারে পাশাপাশি দেখে, যুগপৎ দেখবার পরে বুঝতে আর বাকী থাকে না।

এ'রা উভয় যে সেই দুটি ভয়—ভয়াবহ সেই দুই অভিব্যক্তি—একদা যাঁদের আমরা এইখানেই, এই বারান্দার ধারেই ধাক্কাধাক্কি ক'রে, রেলিং ভেঙে, সবেগে নেমে যেতে দেখেছি—সেই দুই অবতারই আজ এই নবরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সে-বিষয়ে আর সংশয় মাত্র রইল না।

সেদিন এ'দের—এই মারাত্মক মাস্তুতো ভাইদের—অশরীরী দেহে দেখেছিলাম, ওঁদের কার্য্যকলাপও ছিল নিঃশব্দ; কিন্তু আজ—আজ একটু আগেও তো ওঁদের একজন করমর্দ্দনের অজুহাতে নিজের অস্থিমজ্জার অস্তিত্ব আমাদের জানিয়ে দেখেছেন এবং এতক্ষণ ধ'রে কত খোস্‌-গল্পই তো একত্র বসে করা গেল! এসব কি একান্তই মহাপ্রভুদের ছলনা তাহ'লে? সূক্ষ্ম লীলা?

এ'রা কি তাহ'লে—তাহ'লে তাই ছাড়া আর কিছুই নয়? ভাবতে না ভাবতেই আমাদের হৃৎকম্প সুরু হয়।

কিন্তু একটু একটু ক'রে আমাদের ভয় ভাঙে। দু'জনের, দুই মাস্তুতো ভায়ের—গলায়-গলায় ভাব দেখেই সন্দেহ দূর হয়। ওঁদের চালচলন অত্যন্তই

স্বাভাবিক—সাধারণ মানুষের যেমন হয়ে থাকে। কোথাও কোনো ব্যত্যয়—কিছু-মাত্র মারাত্মকতা নেই এবং রেলিং চূর্ণ করাও যে খারাপ কোনো মতলব ওঁরা মনে মনে ভাঁজছেন, ওঁদের আচার-ব্যবহার থেকে ঘুণাক্ষরেও তা বোঝবার যো নেই। তবে বোধহয়, এখনও ওঁরা সম্পূর্ণরূপে ভূতান্তরিত হতে পারেন নি। আগের নশ্বর দেহেই কষ্টেসৃষ্টে রয়ে গেছেন তাহ'লে!

আর তাছাড়া, ভেবে দেখতে গেলে (ভেবে আমাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে), একজন ভূতের পক্ষে (না হয় দু'জনই হলো), পক্ষের পর পক্ষ একখানি পত্রিকা বার করা এবং তার সমস্ত কপি লেখা, তার ওপরে প্রুফ্ দেখা, তারপর সেই-সব প্রেস থেকে ছাপানো (ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে!), তারপর রাস্তার মোড়ে মোড়ে, ষ্টলে ষ্টলে গিয়ে যত না কপি জমা দিয়ে আসা, এবং শেষে সহরের সব হকারদের কাছ থেকে মারামারি ক'রে তার দাম আদায় করা চাট্টিখানি কথা নয়! একজন ভূতের পক্ষে এত ভূতের খাটুনি খাটা কি সম্ভব? দু'জনের পক্ষেও কঠিন। বেশ কঠিন। সত্যিকারের ভূত হ'লে এই ভৌতিক জগৎ ছেড়ে কবে চম্পট দিত!

কিন্তু তবুও, সেই অতীতের কথা মনে হ'লে একটু যেন কেমন—একটু আশ্চর্য্যই লাগে কেমন! ভূত যদি না হয়, তাহ'লে সেদিন তবে কি আমরা ভবিষ্যৎ দেখেছিলাম?

নিছক ভবিষ্যৎ-ই? ভূত নয় তাহ'লে?

খাবার আসার সঙ্গে-সঙ্গেই ও'রা দু'জনেই পাশের ঘরে ঢুকেছিলেন। জলযোগের গোছগাছ করতেই বোধহয়।

আমি আর বিনি মুখোমুখি তাকিয়ে থাকি, এক কথাই দু'জনে ভাবি। কী যে ভাবি, তা আমরাই জানিনে।

একটু পরেই একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসেঃ "এই, এই! তুই খাচ্ছিস্ যে বড়?"

"বাঃ, আমি কষ্ট ক'রে আনলাম, আমি খাব না?"

"তা ব'লে এখন খাবি? এখনই খাবি? অতিথিরা বসে নেই? আগে তাদের দেয়া হোক্।"

"ভারী আমার অতিথি! বদ্যিবাটির আদ্যিখুড়ো আমার! যতই খাওয়াও চাঁদ, ভবী ভুলবার নয়! অনেক তো খাইয়েছ, অনেককেই তো খাইয়েছ! বিনি-পয়সায় লেখা পেয়েছ একটাও? সে-বিষয়ে হুঁসিয়ার, সে পাত্রই নয় ওরা!"

"শুন্‌তে পাবে, চুপ্!"

"শুনলো তো বয়েই গেল। আমি থাকতে 'আব্‌ছায়া'য় আর কারুকে লিখ্‌তে দিচ্ছি না। টাকা দিয়েও না; টাকা নিয়েও নয়। কেবল আমি লিখ্‌ব, আর তুমি, —তুমি সম্পাদক, তুমিও লিখ্‌তে পারো। আর কেউ না।"

"আবদার আর কি! জানিস, আমার কাগজ? তোকে লিখ্‌তে দিয়েছি তাই বর্ত্তে গেছিস্‌। তোর লেখা কেউ ছাপে নাকি?"

"আমার লেখার তুমি কি বুঝবে? জান্‌তো তোমার দাদা। লেখার জন্য রোজ ধর্ণা দিত আমার বাড়ী। ক'জোড়া জুতোই ক্ষইয়ে ফেলেছিল! হুঁঃ!"

"দাদা তুলো না বল্‌ছি! ভালো হবে না কিন্তু!"

"তোমার চেয়ে ভালো লিখি কিনা, সেইজন্যেই তোমার এত রাগ। তা বুঝেছি। কিন্তু তার জন্যে আর কী করবে? কে আর তোমার মুখ চেয়ে খারাপ লিখতে যাচ্ছে? কাল্‌কের ছেলেও তোমার চেয়ে ভালো লিখে তোমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—তোমার চেয়ে নামজাদা হয়ে যাচ্ছে। তা বাপু তুষানল, নিজের অনলে এমন তিলে তিলে আর কত দগ্ধ হবে? তার চেয়ে গলায় দড়ি দাও, সব ল্যাঠা চুকে যাক্‌!"

"দ্যাখ্‌, ভালো হচ্ছে না কিন্তু! এইসা এক থাপ্পড় কসাবো, টের পাবি তখন! সব লম্ফ-ঝম্ফ বেরিয়ে যাবে এক্ষুনি। তোর লেখা ছাপানোও বেরিয়ে যাবে। আর তোর লেখা ছাপ্‌ব না, যাঃ!"

"তোমার লেখাই বা কে ছাপ্‌ছে? নিজের বই তো নিজের টাকায় ছাপো, আবার কথা কইতে আসো! কখানা তার বিক্রি হয়? পরের হিংসেয় জ্বলে মরছ কেবল! সম্পাদক ব'লে কিছু বল্‌ছি না, নইলে—"

তর্জ্জনের তোড়জোড় বেড়েই চলে।

বিনি ভীতিবিহ্বল নেত্রে তাকায়।

হঠাৎ ধাঁ ক'রে একটা রসগোল্লা কক্ষচ্যুত হয়ে ছিট্‌কে আসে, উল্‌কার মত ছুটে আসে, কিন্তু একটুর জন্যে ফস্‌কে যায়। আমার গালে এসে লাগে,—ওদের গোলমাল শুনে আমি হাঁ করে ছিলাম, কিন্তু কোনো ফল হয় না। মুখের মধ্যে না ঢুকে, রসগোল্লাটা গালের গায়ে লেগে, আমাকে বাঁয়ে রেখে নিজের আবেগে ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়।

গতিক ভালো নয়! অন্ততঃ রসগোল্লাদের গতি-বিধি খুব সুবিধের নয়!

কিন্তু তাছাড়াও—আরেকটা খট্‌কা লাগে। চট্‌ ক'রে আমার মনে হয়, অতীত-কালের সেই ভবিষ্যৎ, সেই সুদূরপরাহত সম্ভাবনা, অন্ততঃ বর্ত্তমানে এখনই, নিতান্ত আসন্ন হয়ে আস্‌ছে না তো? ঘোরালো হয়ে, আরো জোরালো হয়ে এবং ঐ ক্ষীণকায় রেলিংএর ওপর যদ্দুর সম্ভব ভারালো হয়ে—য়্যাঁ?

এখন পর্য্যন্ত যারা ভূত হ'তে পারে নি, কিন্তু একদা যাদের ভূত বা ভবিষ্যৎ যাই হোক্‌, আমরা দর্শন করেছিলাম—অকৃত্রিম আসল ভূতে পরিণত হ'তে তাদের কি আর দেরী নেই?

কাঠের রেলিংটা অটুট রয়েছে, এখনো রয়েছে, কিন্তু কতক্ষণ আর এমন থাকবে? ভাব্‌তেই আমরা শিউরে উঠি।

আইন্‌স্টাইন নাকি বলেছিলেন, যা অতীত, তাই ভবিষ্যৎ এবং তারাই আবার

বর্ত্তমান; এক কথায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব একাকার। মোটের ওপর এই গোছের কী একটা কথা বহুবিধ প্রমাণের সাহায্যে আমাদের কাছে তিনি গছাতে চেয়েছিলেন —বলা বাহুল্য, আমার বোধগম্য হয় নি। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তের সাম্‌নে—আগতপ্রায় ওই দুই উদাহরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নিমেষের মধ্যে সেই তত্ত্ব, দুরধিগম্য সেই তথ্য, বিদ্যুৎ-ঝলকের মত আমার মাথার মধ্যে লেগে যায়।

সমস্ত কাল, ইহকাল ও পরকাল, কালাতীত সব রহস্য, এই কালান্তক আসন্নতার কাছাকাছি আস্‌তেই, পলকের মধ্যে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়্‌তে থাকে—চিচিং-ফাঁকের মত পরিষ্কার হয়ে যায়।

বুঝতে পারি, ইতিহাস যেমন ঘুরে-ফিরে আসে, যে-কারণে আসে, তেম্‌নি, সেই কারণেই, অনন্তের অজ্ঞাত-ভাণ্ডারে জমানো একই সব দৃশ্য, অভিন্ন সব কথা, অনুরূপ সব ভাব, যুগে-যুগে খোলস বদ্‌লে যাতায়াত করে। খবরের কাগজের নিউজ্‌ কলমের মত নতুন হুজুগের রূপ নিয়ে, সেই-সব একঘেয়ে পুরাণো খবর পুনরাবৃত্ত হয়। ঘুরে-ফিরে ফের এসে দেখা দেয়—আবার আমরা নতুন ক'রে পড়ি।

হারানো অতীত বাড়ানো বর্ত্তমানে এসে, হারিয়ে গিয়ে আবার অনাগত ভবিষ্যতে উদ্‌যাপিত হ'তে থাকে। সেই উদ্‌যাপনের দায় নিয়ে পুনঃ পুনঃ আমরা জীবন যাপন করি—কিন্তু কার জীবন যাপন করি? আকাশের সংবাদপত্র আগাগোড়া যার পড়া, যার নখদর্পণে, এমন কেউ যদি কোথাও থাকে, সে-ই কেবল তা বল্‌তে পারে।

এই-সব ভাবি, আর কাঠের রেলিংটা আমাদের দিকে চেয়ে কটাক্ষ করে!

আর কিছু না, ভূত ভবিষ্যৎ মাথায় থাক্‌, কেবল বর্ত্তমানের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে—খুনোখুনির সাক্ষী হবার দায়িত্ব থেকে ঘাড় বাঁচাবার জন্যেই আমি আর বিনি, পরস্পরকে করায়ত্ত ক'রে সেই যে সেখান থেকে ছুট্‌ মেরেছি,—বেহালার পথে আর পা বাড়াই নি। কোনোদিন বাড়াবও না।

—সমাপ্ত—

দেব সাহিত্য কুটীর